মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুহ রায়

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

অরবিন্দ ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক জীবন
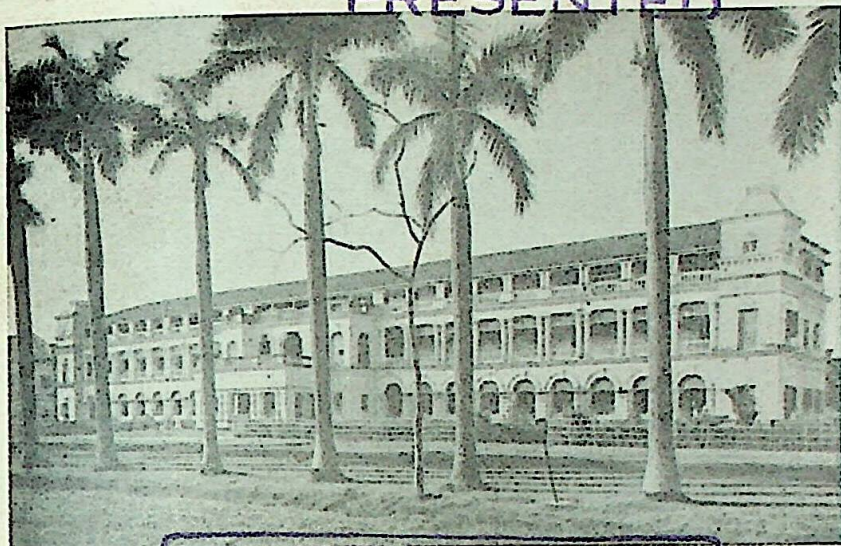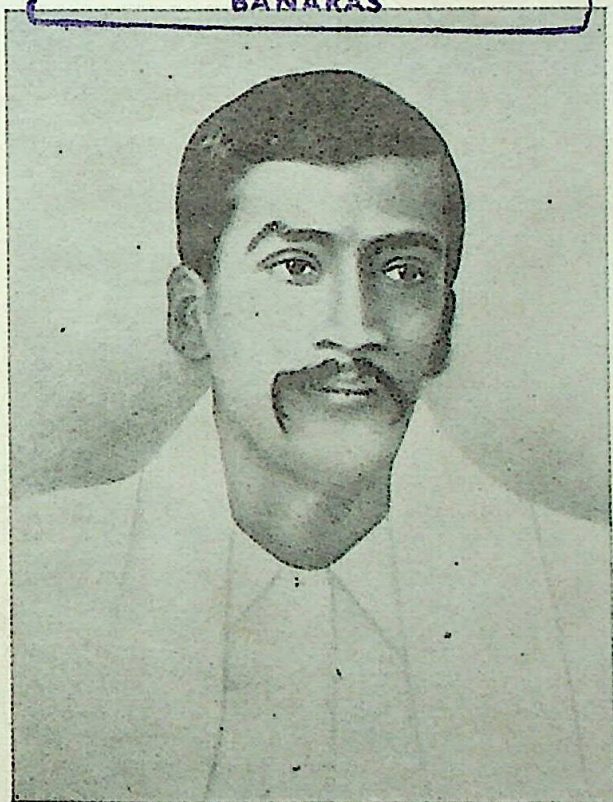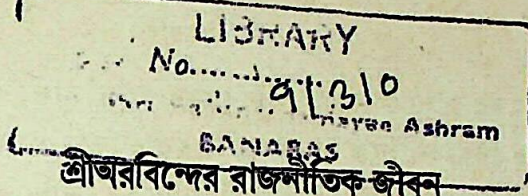
১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট অরবিন্দ ঘোষ কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ (কে. ডি. ঘোষ) বিলাত হইতে আই. এম. এস. পরীক্ষা পাস করিয়া ভারত সরকারের অধীনে সিভিল সার্জন নিযুক্ত হন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম আচার্য, শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সংস্কারক, স্বনামখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় রাজনারায়ণ বসুর প্রথমা কন্যা স্বর্ণলতা হইলেন অরবিন্দের জননী।

পাঁচ বৎসর বয়সে অরবিন্দের পিতা তাঁহাকে শিক্ষালাভের জন্য দার্জিলিং-এর সেণ্ট-পল্‌স স্কুলে পাঠাইয়া দেন। তথায় বালক অরবিন্দ তুই বৎসর শিক্ষালাভের পর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মাতাপিতার সহিত বিলাত যান। চৌদ্দ বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিয়া তিনি ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন। আঠার বৎসর বয়সে তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় অরবিন্দ চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় রেকর্ড নম্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বারোহণের পরীক্ষায় তিনি ইচ্ছা করিয়াই উপস্থিত হন নাই; কেননা তাঁহার উপলব্ধি হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দিয়া মহৎ কর্ম সাধিত হইবে। পিতা মনোবেদনা পাইবেন বলিয়া জানাইয়া দিলেন যে, অশ্বারোহণের পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে আই. সি. এস.-এ নিযুক্ত করা হইল না।

সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিয়া অরবিন্দ আরও অধ্যয়নের জন্য ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাসিক্‌স ট্রাইপস্‌ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সাত বৎসর হইতে একুশ বৎসর পর্যন্ত একাদিক্রমে

চৌদ্দ বৎসর ইংলণ্ডে ইংরাজ পরিবারের মধ্যে বাস করিয়াও এবং তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাইয়াও তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন হন নাই। বিলাতী সমাজের ভোগ-বিলাস তাঁহার খাঁটি ভারতীয় চিত্তের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহা হইতে অরবিন্দের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

অরবিন্দের রাজনীতিক জীবনের গোড়াপত্তন হয় বিলাতে বিদ্যার্থী জীবনে। লণ্ডনে স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় ছাত্রেরা 'লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার' (Lotus and Dagger) নামে একটা গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা।

অরবিন্দের জনজীবন বা public life-এর আরম্ভ হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় বৎসরে। তৎপূর্বেও ভারতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি রাজনীতির চর্চা করিতেন। তৎকালীন কংগ্রেস যে ব্রিটিশ জাতির ন্যায়বোধে আস্থা স্থাপন করিয়া আবেদন-নিবেদন নীতির অনুসরণ করিতেছিল, তাহাতে ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার লাভ সম্ভব নহে বলিয়া অরবিন্দের ধারণা ছিল; এবং তাঁহার সে ধারণা যে নির্ভুল, তাহা উত্তর-কালে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তন হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। বরোদায় বাসকালে তিনি কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি ও কর্মপদ্ধতির কতকগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইয়া বোম্বের ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক পত্রিকায় কয়েকটি জোরালো প্রবন্ধ লিখেন। বোম্বে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্বনামখ্যাত মনীষী ও দেশহিতৈষী স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রানাডে মহাশয় প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন। অরবিন্দের সহিত বরোদায় তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে তাহা লইয়া আলোচনা হয়। বিজ্ঞ বহুদর্শী মনীষী বয়ঃকনিষ্ঠ প্রতিভাবান অরবিন্দের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন

নাই। তবে তিনি অনুরোধ করেন ওই রকমের প্রবন্ধ না লিখিতে, কেননা তাহাতে কংগ্রেসের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে যথেষ্ট।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে নামিবার বৎসর চারেক পূর্বে অরবিন্দ বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়া উহার কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থা অনুসরণ করিলে স্বদেশের দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদানের পরও তিনি বিপ্লবের পথ পরিহার করেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই দুইটি দিকের কাজই তিনি সমতালে প্রবল বেগে চালাইয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় বৎসর (১৯০৬ খ্রীঃ) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার পরিচালনাধীন কলিকাতায় ন্যাশন্যাল কলেজে অরবিন্দ অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। বরোদার মহারাজার অধীনে মাসিক সাড়ে সাত শত টাকার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া মাত্র দেড় শত টাকা মাসিক ভাতায় তিনি সেই পদ নিলেন। মহারাজার পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করেন নাই। অরবিন্দ যে অদূর ভবিষ্যতে বরোদা রাজ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। স্বদেশের হিতকল্পে অরবিন্দের এইপ্রকার ত্যাগ-স্বীকারে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল তাঁহার প্রতি। কিছুকাল কাজ করার পরে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইল কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সহিত মতভেদের জন্য। জাতীয়তা-বাদী দলের নব-প্রকাশিত তৎকালের ভারতবিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদকরূপে অরবিন্দ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। তখনকার দিনে সংবাদপত্রে

সম্পাদকের নাম প্রকাশের আইনত কোন বিধান ছিল না। অরবিন্দ সম্পাদক ছিলেন সত্য, কিন্তু সরকার পক্ষ তাহা প্রমাণ করিতে না পারায় তিনি মুক্তি পাইলেন। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত 'নমস্কার' কবিতা লিখিয়া ওই দেশ-নায়কের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি তুমি।"...

অরবিন্দ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন। সেই বৎসরের ডিসেম্বরে কলিকাতায় দাদা-ভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি যোগ দেন। পরের বৎসর সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি অন্যান্য জাতীয়তাবাদী (ন্যাশন্যালিস্ট) নেতাদের সহিত যোগদান করেন। মধ্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও পরিশেষে সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেসের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া গেল।

অরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধ মল্লিক এবং চারুচন্দ্র দত্ত ছিলেন বাংলার বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির যুগান্তর বিপ্লবী দলের অধিনায়ক-মণ্ডলীতে। তাঁহারা অত্যাচারী বিচারক কলিকাতার ভূতপূর্ব চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবকে বধ করিবার আদেশ দেন। তিনি তখন বিহারের মজঃফরপুরে জেলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত ছিলেন। দলের পক্ষ হইতে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু বোমা ও রিভলভার লইয়া তথায় যান। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল রাত্রিতে তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় ভুলক্রমে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে সেই আঘাতের দরুন উভয়ের প্রাণবিয়োগ হইল। ১লা মে ক্ষুদিরামকে ঘটনাস্থল হইতে ২৪ মাইল দূরে দুইজন কনস্টেবল গ্রেফতার করে। ২রা মে মোকামাঘাট স্টেশনে

প্রফুল্ল চাকীকে ধরিবার চেষ্টা করিলে তিনি রিভলভারের গুলিতে আত্মহনন করেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরামই প্রথম শহীদ।

বোমা নিক্ষেপের ঘটনার দুই দিন পরেই কলিকাতার নানা স্থানে খানাতল্লাশ হয়। ফলে, মানিকতলা অঞ্চলের ৩২নং মুরারীপুকুর রোডে অরবিন্দ ঘোষ ও ভ্রাতৃগণের বাগানবাড়িতে বিপ্লবী দলের বোমার কারখানা ও অস্ত্রাগার আবিষ্কৃত হইল। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি গ্রেফতার হইলেন। ইহা হইতেই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বিখ্যাত মানিকতলা বোমার মামলার সৃষ্টি। এই মামলায় অরবিন্দ ছিলেন প্রধান আসামী। তাঁহাকে সরকার পক্ষ হইতে বিপ্লবী দলের প্রধান নায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আলিপুর (চব্বিশ পরগনা জেলা) সেসন আদালতে অরবিন্দ সহ ৩৭জন আসামীর বিচার হইয়াছিল। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ, নরহত্যা, বিনা পাসে অস্ত্রাদি রাখা ইত্যাদি অভিযোগে তাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৎসরাধিক কাল বিচারাধীন আসামীরূপে কারাবাসের পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে অরবিন্দ এবং অন্যান্য কয়েকজন আসামী মুক্তি পাইলেন। অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন ব্যারিস্টার মিঃ সি. আর. দাশ—যিনি পরবর্তী কালে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে 'দেশবন্ধু' নামে খ্যাতিলাভ করেন।

কারামুক্তির পরে অরবিন্দ পূর্ণ উদ্যমে পুনরায় দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হইল ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র 'কর্মযোগিন' এবং বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 'ধর্ম'। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি জটিল ও সংকটাপন্ন। লর্ড মিণ্টো তখন ভারতের বড়লাট, আর লর্ড মর্লি ভারতসচিব। স্বৈরাচারী বিদেশী শাসকের নির্যাতন নীতি

অনুসৃত হইতেছিল নিরঙ্কুশভাবে। সুরাট কংগ্রেসের পরে দুইটি প্রধান রাজনীতিক দলের পুনর্মিলন তখন পর্যন্ত হয় নাই। প্রকাশ্য বৈধ আন্দোলন এক প্রকার বন্ধ। দমন নীতির প্রাবল্য সত্ত্বেও বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী দলের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মধ্যপন্থী দলকে হাত করিয়া দমন নীতি প্রয়োগের দ্বারা জাতীয়তাবাদী দল ও বিপ্লবী দলকে নিষ্পেষিত করিবার অভিসন্ধিতে প্রবর্তিত হইল মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার। এই তথা-কথিত সংস্কারে জনগণকে প্রকৃত রাজনীতিক অধিকার কিছুই দেওয়া হয় নাই; তথাপি মধ্যপন্থী দল ভিক্ষার ওই খুদকুঁড়ো পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন।

অরবিন্দ তাঁহার সম্পাদিত 'কর্মযোগিন' এবং 'ধর্ম' পত্রিকার মাধ্যমে দেশের মৃতপ্রায় রাজনীতিক জীবনে শক্তি সঞ্চারিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। সরকারী দমন নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া সরকারকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এইরূপ নীতি অনুসৃত হইলে প্রকাশ্য বৈধ আন্দোলন বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ফলে গুপ্ত অবৈধ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তিনি নয়া শাসন-সংস্কারের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, ইহা বিকট ও কৃত্রিম—'monstrous and misbegotten'। অরবিন্দ প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া মধ্যপন্থী দলের দুর্বলতা ও ভিক্ষুকোচিত মনোবৃত্তির নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদিগণকে পুনরায় সংঘবদ্ধ হইয়া রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে নামিতে আহ্বান করিলেন। এই সঙ্গে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) এবং বয়কট নীতির প্রয়োগের কথাও দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন।

অরবিন্দের সতেজ লেখনী কাজ করিতে লাগিল তীক্ষ্ণ কৃপাণের মত। বিদেশী শাসকমণ্ডলী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বশংবদ ভৃত্যেরা ওত পাতিয়া রহিলেন অরবিন্দকে রাজদ্রোহী

আইনের বেড়াজালে আটকাইবার জন্য। অবশেষে 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় অরবিন্দ ঘোষের স্বাক্ষরে প্রকাশিত 'টু মাই কান্ট্রিমেন' (আমার দেশবাসিগণের সমীপে) শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারামতে অভিযোগ আনা স্থির হইল। অরবিন্দ কোন সূত্রে ইহা জানিতে পারিয়া গ্রেফতারী পরোয়ানা বাহির হইবার পূর্বেই সরিয়া পড়েন। তিনি ব্রিটিশ এলাকা ছাড়িয়া ফরাসী-শাসিত চন্দননগরে যাইয়া স্বনামখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীমতিলাল রায়ের গৃহে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে মতিবাবুর গৃহ হইতে তাঁহাকে চন্দননগরের মধ্যেই অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। সেই কার্যে স্থানীয় গোন্দলপাড়ার বিপ্লবী দলের সাহায্য ও সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। ঐভাবে কিছুকাল অজ্ঞাতবাসের পরে অরবিন্দ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল কলিকাতায় 'ডুপ্লেক্স্' নামক জাহাজে করিয়া গোপনে ফরাসী-শাসিত পণ্ডিচেরিতে চলিয়া যান। তদবধি তিনি তিরোভাব পর্যন্ত তথায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে বাস করেন।

'কর্মযোগিন' পত্রিকায় রাজদ্রোহের মামলায় মনোমোহন ঘোষ প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। হাইকোর্টের বিচারে প্রবন্ধটি রাজদ্রোহাত্মক নহে বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক মনোমোহন ঘোষ মুক্তি পান।

পণ্ডিচেরি যাইবার পরেও অরবিন্দ মতিবাবুর মাধ্যমে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির কার্য পরিচালনা সম্পর্কে নির্দেশাদি দিতেন। তাঁহার রচনা ও বাণীর মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে তিনি রাজনীতিক মতামতও ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিচেরি বাসের পর হইতে তাঁহার সক্রিয় রাজনীতিক জীবনের উপর যবনিকাপাত হইয়াছে।

ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশের জন্য তাঁহাকে অনেকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সুনিশ্চিত এবং সেজন্য তাঁহার আর কিছু করিবার নাই। তাঁহার যাহা করণীয় ছিল, তাহা পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে (১৯০৬ খ্রীঃ—১৯১০ খ্রীঃ) ভারতের মত একটা বিশাল দেশে রাজনীতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা, সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করা অরবিন্দ ব্যতীত আর কোন ভারতীয় দেশনায়কের ভাগ্যে ঘটে নাই।

শ্রীঅরবিন্দ ও 'বন্দে মাতরম্'
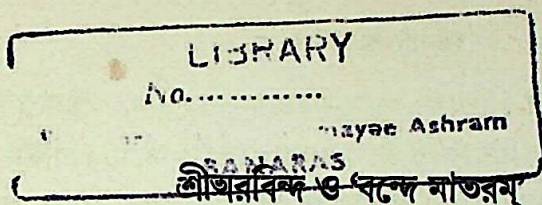
স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যপর্বে ১৯০৬ সনের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হইল জাতীয়তাবাদী দলের মুখপত্র ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্'। প্রথম দিকে উহা প্রকাশের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন স্বনামখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা কালীঘাটের হালদার পরিবারের হরিদাস হালদার মহাশয়। ১৯৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের সারস্বত প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ওই স্থান হইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন এ. পি. মুখার্জি এবং ম্যানেজার ছিলেন এন. এল. দত্ত। প্রথম দিকে প্রখ্যাত বাগ্মী, লেখক ও ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির অন্যতম নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নাম ওই পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া প্রকাশিত হইত। তৎকালের সংবাদপত্রে সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক ছিল না।

বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ স্থির করিলেন যে, একটি লিমিটেড্ কোম্পানী গঠন করিয়া 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। তদনুসারে 'বন্দে মাতরম্ প্রিণ্টার্স্ এবং পাবলিসার্স্ লিমিটেড্' নামে একটি কোম্পানী রেজেস্টারী করা হইল। পত্রিকার কার্যালয় স্থানান্তরিত হইল ২/১নং ক্রীক রোতে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের একটি বাড়িতে এবং তথায় প্রিন্টিং প্রেসও বসানো হইল। ডিরেক্টর বোর্ডে ছিলেন ঃ—রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, শরৎচন্দ্র সেন, সুন্দরীমোহন দাস, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, রজতনাথ রায়, বিজয়চন্দ্র চাটার্জি, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার বিক্রীত হইয়া গেল।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন—অরবিন্দ

ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জি ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকার সম্পাদক রূপে কাহারও নাম প্রকাশিত হইত না, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে অরবিন্দ ঘোষই ছিলেন প্রধান সম্পাদক। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া অরবিন্দ ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছাড়িয়া দিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলার জাতীয়তা-বাদী দলের রাজনীতিক লক্ষ্য ও কর্মপন্থা প্রচারিত হইতে লাগিল নির্ভীক ভাবে জ্বলন্ত ভাষায়। ওই দলের লক্ষ্য ছিল 'Absolute Autonomy free from British control' অর্থাৎ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা। কর্মপন্থা ছিল—রাজদরবারে আবেদন নিবেদনের পরিবর্তে আত্মশক্তির উপর নির্ভর এবং প্রয়োজন হইলে বিদেশী শাসনযন্ত্রকে বিকল করিবার জন্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পন্থা (passive resistance) অবলম্বন। অল্প কাল মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' সমগ্র ভারতে লোকপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্ভীক সংবাদপত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' ছিল বিপ্লববাদী দলের মুখপত্র। ইহাতে প্রকাশ্যেই বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের বাণী প্রচারিত হইত। এই পত্রিকার পরিচালনায় অরবিন্দ ঘোষের উপদেশ গোপনে লওয়া হইত। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কিংবা সংবাদ প্রচারে আইনের সীমা লঙ্ঘন করা হইত না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। ১৯০৭ সালের মধ্যভাগে যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাবুলী দাওয়াই' নামক একটা বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইল 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায়। প্রবন্ধের বক্তব্য ছিল—কাবুলীরা যেমন দাবি আদায়ের জন্য বল প্রয়োগ করে, তেমনই বিদেশী শাসকদের কাছ হইতে ভারতবাসী স্বরাজ পাইবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে পারে। ওই প্রবন্ধ রচনা

ও প্রকাশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইল অরবিন্দ ঘোষকে ও মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসুকে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্ফোর্ডের আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইল। পত্রিকায় সম্পাদক বলিয়া অরবিন্দ ঘোষের নাম প্রকাশিত হইত না। সুতরাং তাঁহাকে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক প্রমাণের জন্য সরকার পক্ষ হইতে সাক্ষী মানা হইল বিপিনচন্দ্র পালকে। তিনি যদি সাক্ষ্য দেন তবে তাঁহাকে সত্য কথা বলিতে হইবে এবং সত্য কথা বলিলে অরবিন্দ সম্পাদক বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। ফলে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁহার কারাদণ্ড সুনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় বিপিনবাবু স্থির করিলেন যে, তিনি আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হলফ লইবেন না; সুতরাং তাহাকে আর সাক্ষ্য দিতে হইবে না। কিন্তু হলফ লইতে অস্বীকার করিলে তাঁহাকে আদালত অবমাননার দায়ে পড়িয়া দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ইহা অবগত থাকিয়াও তিনি ওই সংকটের পথই বাছিয়া লইলেন, যেহেতু তাহাতে তাঁহার সহকর্মী বন্ধু অরবিন্দ মুক্তি পাইবেন।

বিপিনবাবু হলফ লইতে অস্বীকার করিয়া আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। আইন মতে চরম দণ্ড ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে তাঁহাকে দণ্ডিত করা হইল। অরবিন্দকে সম্পাদক বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারায় তিনি মুক্তি পাইলেন। মুদ্রাকরের সাজা হইল। অরবিন্দের রাজদ্রোহের মামলায় মুক্তি উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন তাঁহার রচিত বিখ্যাত 'নমস্কার' কবিতার মধ্য দিয়া :—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্তি তুমি।"...

বিপিনচন্দ্র সতেজ স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে কহিয়াছিলেন :—

"I have conscientious objection against taking part in a prosecution which I believe to be unjust and injurious to the cause of popular freedom and the interest of public peace.

I refuse to answer any question in connection with this case."

অর্থাৎ—সরকার পক্ষের আনীত যে মামলা আমি অন্যায় ও গণ-স্বাধীনতার উদ্দেশ্যের এবং জন-শান্তির স্বার্থের হানিকর বলিয়া বিশ্বাস করি, উহার অংশভাগী হইতে আমার বিবেকানুগ আপত্তি আছে। এই মামলা সম্পর্কিত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অস্বীকার করি।

শ্রীঅরবিন্দ-ভক্ত সুসাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার রচিত 'ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"বন্দে মাতরম্ শ্রীঅরবিন্দের মানস সন্তান। তাই হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া তিনি ইহাকে নবীন দলের শক্তিশালী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখপত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ভারতে জাতীয় ভাবধারা প্রচারের গৌরব সেদিন 'বন্দে মাতরম্' যে ভাবে লাভ করিয়াছিল এবং সেই দুর্লভ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহার যে একনিষ্ঠ এবং নির্ভীক প্রয়াস, তাহা ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের এই কীর্তিস্তম্ভ আজ স্মৃতির বিষয় হইলেও, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে ইহা কোনও দিনই বিলুপ্ত হইবে না। পরবর্তী কালে জাতীয় মহাসভায় যে নবীন রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার প্রাণ-শিল্পী ছিলেন 'বন্দে মাতরমে'র শ্রীঅরবিন্দ।

'বন্দে মাতরম্' দেশের লোকের চিন্তায় বিপ্লব আনিয়া দিল, দলের শক্তি বৃদ্ধি করিল, ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দিল, নবীন

ও প্রবীণের সংঘর্ষ আসন্ন এবং অনিবার্য করিয়া তুলিল। মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে 'সুদর্শন' আর নবীন ভারতে শ্রীঅরবিন্দের হস্তে 'বন্দে মাতরম্' একই কাজ করিয়াছে। ইহা তত্ত্ব বা দর্শনের কথা নহে—ইতিহাস-সম্মত সত্য।"

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যপর্বে তৎকালীন বিদেশী সরকার ক্ষিপ্ত হইয়া এমন কঠোরতার সহিত নির্যাতন-নীতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, কিছুকাল পরে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা বন্ধ হইয়া গেল। সন্ধ্যা, যুগান্তর এবং নবশক্তি পত্রিকাগুলিও বন্ধ হইয়া গেল।
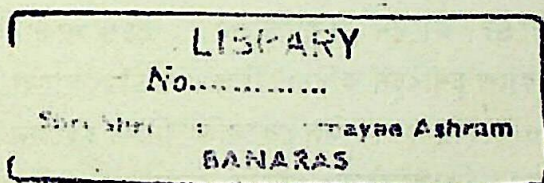
শ্রীঅরবিন্দের বন্দী জীবন

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ) বৃহস্পতিবার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস। সেদিন অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে বিহারের মজঃফরপুর শহরে ইউরোপীয়ান ক্লাবের প্রবেশ-দ্বারে একখানি চলন্ত ফিটন গাড়ী লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করিলেন—প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু। উভয়েই কলিকাতার যুগান্তর বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির মৃত্যু-মন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ সদস্য। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল—কলিকাতার ভূতপূর্ব প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট (তৎকালে মজঃফরপুরের জেলা ও দায়রা জজ) মিঃ কিংসফোর্ডকে নিধন করা। তিনি কলিকাতায় কয়েকটি রাজনীতিক মামলায় আসামীদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং সুশীল সেন নামক পনর বৎসর বয়স্ক একটি ছাত্রের প্রতি ফিরিঙ্গি পুলিস সার্জেন্টকে প্রহার করার অভিযোগে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটিয়া গাড়ীর একাংশ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল। গাড়ীর আরোহিনী মিসেস্ কেনেডি ও তাঁহার কন্যা মিস্ কেনেডি নিহত হইলেন এবং সহিস আহত হইল। কিংসফোর্ডের গাড়ীর সঙ্গে ওই গাড়ীখানির সাদৃশ্য ছিল বলিয়া ভুলক্রমে নিহত হইলেন ওই দুই জন ইংরেজ মহিলা।

পরদিবস পয়লা মে মজঃফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরবর্তী একটি রেল স্টেশনের নিকটে ক্ষুদিরাম রিভল্‌ভার ও কার্তুজ সহ ধরা পড়েন। দোসরা মে মোকামাঘাট রেল স্টেসনে পুলিস প্রফুল্ল চাকীকে ধরিবার চেষ্টা করিলে তিনি নিজের ললাটে উপর্যুপরি দুই বার রিভল্‌ভার দিয়া গুলী করিয়া আত্মহনন করেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। মজঃফরপুরের বোমা নিক্ষেপের ঘটনা হইতে

উদ্ভব হইল মানিকতলা বোমার মামলার। আলিপুরে (২৪ পরগনা জেলার) দায়রা জজের আদালতে বিচার হইয়াছিল বলিয়া উহাকে আলিপুর বোমার মামলাও বলা হইয়া থাকে। ২রা মে কলিকাতার নানা স্থানে খানাতল্লাশী হয়। মানিকতলা অঞ্চলে মুরারীপুকুর রোডে অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের বাগান-বাড়ীতে বোমা নির্মাণের ছোট একটা কারখানা এবং অস্ত্রাগার আবিষ্কৃত হইল। তাজা বোমা এবং বোমা তৈয়ারী করার দ্রব্য ও যন্ত্রাদি, রিভল্‌ভার, পিস্তল, রাইফেল, কার্তুজ এবং রাজদ্রোহাত্মক কাগজপত্র ইত্যাদি পুলিস হস্তগত করিল। তৎকালে অরবিন্দ সপরিবারে বাস করিতেন ৪৫নং গ্রে স্ট্রীটে বাংলা দৈনিক সংবাদ-পত্র 'নবশক্তি' কার্যালয়ে। সে বাড়ীতেও খানাতল্লাশী হইল; কোন আপত্তিকর বা বেআইনী দ্রব্য না পাইলেও অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলেন। মানিকতলা বাগানে এবং কলিকাতার অন্যান্য স্থানে আরও অনেকে গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (অরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর), হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, অবিনাশ ভটাচার্য, শৈলেন বসু, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি। শ্রীরামপুরে (হুগলী) গ্রেপ্তার হইলেন জমিদার-পুত্র নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, মেদিনীপুরে গ্রেপ্তার হইলেন সত্যেন বসু এবং আরও কয়েক জন।

অরবিন্দের বাসভবনে খানাতল্লাশী আরম্ভ হইয়াছিল ভোর প্রায় সাড়ে পাঁচটায় এবং তাহা শেষ হইল বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায়। পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান ও ক্লার্ক, ইনস্পেকটার বিনোদ গুপ্ত প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে খানাতল্লাশী চলে। অরবিন্দের শোবার ঘরে চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি কোন প্রকারের আসবাব ছিল না; মেঝের উপর পাতা একখানা মাদুরে তিনি শোয়া ছিলেন। দেখিয়া ক্রেগান সাহেব যে মন্তব্য করেন এবং অরবিন্দ

যে উত্তর দেন, তাহা তাঁহার বাংলা ভাষায় রচিত "কারাকাহিনী" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

..."ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি নাকি বি.এ. পাস করিয়াছেন ? এইরূপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে ?" আমি বলিলাম, "আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।" সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, "তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন ?" দেশ-হিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ বা দারিদ্র্য ব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।"

অরবিন্দকে হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধা হইয়াছিল, এবং একজন কনস্টবল সেই দড়ি ধরিয়া তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় আধঘণ্টা পরে কি অজ্ঞাত কারণে হাতকড়ি ও কোমরের দড়ি খুলিয়া লওয়া হয়। প্রথমে তাঁহাকে নেওয়া হইল মানিকতলা থানায়, তথা হইতে লালবাজারে, লালবাজার হইতে রয়েড স্ট্রীটে গোয়েন্দা পুলিসের অফিসে এবং সেখান হইতে আবার লালবাজার হাজতে আনা হইল। ৪ঠা মে সোমবার অরবিন্দ ও অন্যান্য ধৃত বিপ্লবীদের স্থানান্তরিত করা হয় আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে। বিচারাধীন আসামীরূপে এইখানেই তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল বৎসরাধিক কাল। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেষ্টা, নরহত্যা, বেআইনী ভাবে অস্ত্রাদি রাখা ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগে তাঁহার ও অন্যান্য আসামীর বিচার হইয়াছিল। 'কারাকাহিনী'র আরম্ভে মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন :—

"জানিতাম না যে এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসরের কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল, সবই ছিন্ন হইবে,

এক বৎসর কাল মানব-সমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে। বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস,—বলা উচিত ছিল, এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস। অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্ম্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার।"

জেলখানায় অরবিন্দকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল একটি নির্জ্জন ক্ষুদ্র কারা-কক্ষে। কারাবিধি অনুসারে গুরুতর অভিযোগে দণ্ডিত কিংবা কারাগারের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কয়েদীকে ওই শ্রেণীর ঘরগুলিতে আটক করিয়া রাখা হয়। শ্রীঅরবিন্দ বিচারাধীন আসামী। ইংরাজের রচিত আইনের বিধান মতে বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু ইংরাজের জেলখানায় বোমার মামলার প্রধান আসামী শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার সঙ্গীয় অন্যান্য বিচারাধীন আসামীর প্রতি করা হইল বিপরীত আচরণ। তৎকালে রাজনীতিক আসামীদের জেলখানায় বলা হইত 'স্বদেশী বা বন্দেমাতরম্ কয়েদী!' শ্রীঅরবিন্দ সেই নির্জন কারাকক্ষটির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই:

"আমার নির্জ্জন কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্ত ছিল,

ইহার জানালা নাই, সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরি ভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্র, দরজা বন্ধ হইলে শান্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময়-সময় দেখে কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এইরূপ ছয়টি ঘর পাশাপাশি, সেইগুলিকে ছয় ডিক্রী বলে। ডিক্রির অর্থ, বিশেষ সাজার ঘর—বিচারপতি বা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুমে যাহাদের নির্জ্জন কারাবাসের দণ্ড নির্দ্ধারিত হয়, তাহাদেরই এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গহ্বরে থাকিতে হয়। এই নির্জ্জন কারাবাসেরও কম বেশী আছে। যাহাদের বিশেষ সাজা হয়, তাহাদের উঠানের দরজা বন্ধ থাকে; মনুষ্য সংসার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া শান্ত্রীর চক্ষু ও পরিবেশনকারী কয়েদীর দুবেলার আগমন তাহাদের জগতের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ। আমা হইতেও হেমচন্দ্র দাস সি. আই. ডি.-র আতঙ্কস্থল বলিয়া তাহার জন্য এই ব্যবস্থা হইল। এই সাজার উপরও সাজা আছে,—হাতে পায়ে হাতকড়া ও বেড়ি পরিয়া নির্জ্জন কারাবাসে থাকা। এই চরম শাস্তি কেবল জেলের শান্তিভঙ্গ করা বা মারামারির জন্য নয়, বার বার খাটুনিতে ত্রুটি হইলেও এই শাস্তি হয়। নির্জ্জন কারাবাসে মোকদ্দমার আসামীকে শাস্তি স্বরূপ এইরূপ কষ্ট দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ, তবে স্বদেশী বা 'বন্দেমাতরম্'-কয়েদী নিয়মের বাহিরে, পুলিসের ইচ্ছায় তাহাদের জন্যও সুবন্দোবস্ত হয়।"

ঘরের আসবাব বলিতে কিছুই ছিল না। প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে ছিল মাত্র "জল রাখিবার একটি টিনের নলাকার বালতি, একখানা লোহার ছোট থালা, একটা লোহার বাটি এবং দুইখানা জেলের তৈয়ারী মোটা খস্‌খসে কম্বল।" সেই নির্জন 'গহ্বরে' (সলিটারী সেল'-এ) তাঁহাকে দিবারাত্রি নিঃসঙ্গ জীবন

যাপন করিতে হইত। বন্দী-জীবনের প্রথম দিকে তাঁহাকে পড়িবার জন্য পুস্তকাদি পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। কিছু দিন পরে তাঁহার মেসোমহাশয় 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার জন্য গীতা ও উপনিষদ্ পাঠাইয়া দেন। ওই ছোট ঘরখানি—খাওয়া, শোয়া ও পায়খানা—তিনটি কাজের জন্যই ব্যবহৃত হইত। যে লোহার থালা ও বাটির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেইগুলিকে কেহ যেন এনামেলের বাসন বলিয়া ভুল না বুঝেন; ওই বাসন দুইখানি এমন খাঁটি লোহায় গড়া যে, জল দিয়া ধুইবার পরে সঙ্গে-সঙ্গে শুখ্না কাপড় বা ন্যাকড়া দিয়া না মুছিয়া ফেলিলে কিছুক্ষণ পরেই সেগুলিতে মরিচা পড়িত। লোহার বাটি দিয়া শৌচক্রিয়া, মুখ ধোওয়া, স্নান-আহার, জলপান ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় কার্যগুলি করিতে হইত। শ্রীঅরবিন্দ 'কারাকাহিনী-'তে ওই লোহার বাটির যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা সুন্দর ও উপভোগ্য! ওই বাটিকে তিনি তুলনা করিয়াছেন 'সর্বকার্যক্ষম' 'ব্রিটিশ সিভিলিয়ান-'এর সঙ্গে। তাঁহার মতে—"ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান।"......"এমন সর্ব্বকার্য্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরেজের জেলেই পাওয়া সম্ভব।" মনুষ্য-বাসের অযোগ্য নির্জন গহ্বরে আবদ্ধ থাকা কালে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপে অশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছে, এবং ঝড়-বৃষ্টির সময় ভিজিতে ভিজিতে দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। কারাগারে বন্দী-জীবনের নানাবিধ দুঃখকষ্টের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া শ্রীঅরবিন্দ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়ংদশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিঃ

"আমরা সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, অনেকে জমিদারের ছেলে, কয়েক জন—বংশে, বিদ্যায়, গুণে, চরিত্রে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় লোকের সমকক্ষ। আমরা যে অভিযোগে ধৃত, তাহাও সামান্য খুন, চুরি, ডাকাতি নয়; দেশের জন্য বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ চেষ্টা করা বা সমরোদ্যোগের ষড়যন্ত্র। তাহাতেও অনেকের দোষের

সম্বন্ধে প্রমাণের নিতান্ত অভাব, পুলিসের সন্দেহই তাহাদের ধৃত হইবার একমাত্র কারণ। এইরূপ স্থলে সামান্য চোর ডাকাতদের মত রাখা—চোর ডাকাত কেন, পশুর ন্যায় পিঞ্জরে রাখিয়া পশুর অখাদ্য আহার খাওয়ান, জলকষ্ট, ক্ষুৎপিপাসা, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত সহ্য করান ইহাতে বৃটিশ রাজপুরুষদের ও বৃটিশ জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ইহা কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রগত দোষ। ইংরাজদের দেহে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ থাকিলেও শত্রু বা বিরুদ্ধাচরণকারীর সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় তাঁহারা যোল আনা বেনে।" .....

এইভাবে দীর্ঘকাল নির্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ থাকিলে কোন কোন বন্দীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং কেহ কেহ আত্মহত্যার সাহায্যে অসহনীয় দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার জ্বালা হইতে অব্যাহতি পায়। বোমার মামলায় ধৃত হইয়া বন্দী হইবার পূর্ব হইতেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন যোগাভ্যাস ও তপস্যার মধ্য দিয়া। নির্জন কারাবাস কালে তিনি পুনরায় অধ্যাত্ম সাধনায় মগ্ন থাকিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু প্রথমে তাহাতে ব্যর্থ হইয়া পরে সফলতা লাভ করেন। এই সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন ঃ

......"একদিন অপরাহ্ণে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তা আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তাসকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে, বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন মনে পড়িল যে বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ংলুপ্ত বা এক মুহূর্ত্ত ভ্রষ্ট হয় নাই, বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব্ব ক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু আমি উন্মত্ততা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল, সমস্ত শরীরময় এমন

শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে, পূর্ব্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনেই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল। ইহার পরে কয়েক বার বদ্ধাবস্থার অশান্তি, নির্জ্জন-কারাবাস ও কর্ম্মহীনতায় মনের অশোয়াস্তি, শারীরিক ক্লেশ ও ব্যাধি, যোগান্তর্গত কাতর অবস্থা ঘটিয়াছে; কিন্তু সেদিনে ভগবান এক মুহূর্ত্তে অন্তরাত্মায় এমন শক্তি দিলেন যে, এই সকল দুঃখ মনে আসিয়াও মন হইতে চলিয়া যাইবার পরে কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিতে পারিত না, দুঃখের মধ্যেই বল ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বুদ্ধি মনের দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইত। সেই দুঃখ পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ বোধ হইত। তাহার পরে যখন পুস্তক আসিল, তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বই না আসিলেও আমি থাকিতে পারিতাম।”……

বোমার মামলার প্রাথমিক তদন্তকালের শুনানী হইয়াছিল আলিপুরের সিভিলিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লির আদালতে এবং পরে সেস্‌ন জজ মিঃ বিচক্রফ্‌ট্‌ (আই. সি. এস.)-এর আদালতে এসেসরের সাহায্যে বিচার-কার্য সম্পন্ন হয়। নির্জন কারাকক্ষে দুই সপ্তাহের অধিক কাল আবদ্ধ থাকার পর শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার সঙ্গীয় আসামিগণকে প্রথম যেদিন কোর্টে লইয়া যাওয়া হয়, সেই দিনের বর্ণনা দিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ

“পনর ষোল দিনের বন্দী অবস্থার পরে স্বাধীন মনুষ্যজীবনের সংসর্গ ও পরস্পরের মুখ দর্শনে অন্যান্য কয়েদীদের অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়াই তাহাদের হাসি ও কথার ফোয়ারা খুলিয়া যাইত এবং যে দশ মিনিট কাল তাহাদিগকে গাড়ীতে থাকিতে হইত, তাহার এক মুহূর্ত্তও সেই স্রোত থামিত না।”……

মামলার শুনানিকালেও শ্রীঅরবিন্দ আসামীর কাঠগড়ায় বসিয়া প্রায়ই ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। প্রথম প্রথম আদালতের হট্টগোলের মধ্যে তিনি মনঃস্থির করিতে পারিতেন না। সেই সময়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবৎ-কৃপায় নির্জন-কারাকক্ষে যে ধ্যান ও যোগ-সাধনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল, সাময়িক ভাবে স্থান-পরিবর্ত্তনে তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু অল্প কাল মধ্যে আদালতেও সাধনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হইল। কাঠগড়ায় উপবিষ্ট সঙ্গীয় আসামীদের হাসি-তামাশার হৈ চৈ এবং আদালত-গৃহের গোলযোগের মধ্যেও তিনি প্রায়ই ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কি বলিয়াছেন তাহা শুনাইতেছি :

"নির্জ্জন কারাবাসের নীরবতা হইতে হঠাৎ বহির্জগতের কোলাহলের মধ্যে আনীত হইয়া প্রথম মন বড় বিচলিত হইল, সাধনার স্থৈর্য্যভঙ্গ হইল এবং সেই পাঁচ ঘণ্টা কাল মোকদ্দমার নীরস ও বিরক্তিকর কথা শুনিতে মন কিছুতে সম্মত হইল না। প্রথম আদালতে বসিয়া সাধনা করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু অনভ্যস্ত মন প্রত্যেক শব্দ ও দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হইত, গোলের মধ্যে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইত, পরে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, এবং সমীপবর্ত্তী শব্দ দৃশ্য মনের বহির্ভূত করিয়া সমস্ত চিন্তাশক্তি অন্তর্মুখী করিবার শক্তি জন্মাইয়াছিল, কিন্তু মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় তাহা ঘটে নাই, তখন ধ্যানধারণার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। সেই কারণে এই বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতাম, অবশিষ্ট সময় বিপদকালের সঙ্গীদের কথা ও কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতাম, অথবা কখনও নর্টন সাহেবের শ্রবণ-যোগ্য কথা বা সাক্ষীর সাক্ষ্যও শুনিতাম। দেখিলাম নির্জ্জন কারাগৃহে যেমন সময় কাটান সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিয়াছে, জনতার মধ্যে এবং সেই গুরুতর মোকদ্দমার জীবন-মরণের খেলার

মধ্যে সময় কাটান তেমন সহজ নয়। অভিযুক্ত বালকদের হাসি-তামাসা ও আমোদ-প্রমোদ শুনিতে ও দেখিতে ভাল লাগিত, নচেৎ আদালতের সময় কেবলই বিরক্তিকর বোধ হইত। সাড়ে চারটা বাজিলে সানন্দে কয়েদীদের গাড়ীতে উঠিয়া জেলে ফিরিয়া যাইতাম।"

শ্রীঅরবিন্দের বন্দী-জীবনের সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর ঘটনা,—আলিপুরের জেলখানার মধ্যে সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্ত কর্তৃক রাজসাক্ষী বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইর হত্যা। বিচারে দুইজনেরই ফাঁসি হইয়াছিল। উভয়ই ছিলেন বোমার মামলার বিচারাধীন আসামী এবং 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট সদস্য। মামলার প্রথম দিকে আসামীদের কিছুদিন নির্জন কারাবাসে আবদ্ধ রাখার পরে সকলকে একসঙ্গে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু নরেন্দ্র-নিধন কাণ্ডের পর পুনরায় নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা হইল। কারাবাস-কালে শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনা এবং ধ্যানমগ্ন থাকার চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর কাহিনী তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের "বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী" এবং স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্বাসিতের আত্মকথা" নামক পুস্তক দুইখানিতেও বর্ণিত হইয়াছে। বারীনবাবু লিখিয়াছেন ঃ

"......অরবিন্দ মৌন নিশ্চল আসনে দিবারাত্র সাধনায় মগ্ন, জেল-কুঠ্‌রীতে তাঁহার সেই অবস্থা, কোর্টের একটি কোণে একান্তে আপনাতে আপনি ডুবিয়া তাঁহার তদবস্থা।

"আমাদের সাধনায়—কথা ছিল, গান ছিল, শাস্ত্রপাঠ, তর্কবিতর্ক ছিল; তাঁহার সাধনা কিন্তু একেবারে মৌন অন্তর্মুখ একাগ্র ব্যাপার; তাঁহার সঙ্গী ছিল না, কাজ ছিল না, ছিল শুধু পূর্ণ উৎসর্গে—

যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্ত নন্দতি নন্দতি নন্দতোব॥

"দেখিলে মনে হইত এ মানুষ আর বহির্জ্ঞানে জাগিয়া নাই,

যেন স্বপ্নে চলিতেছে, বলিতেছে, যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাহিরের দুয়ার দিয়া অন্তরের কোন্ নিভৃত পুরীর মহোৎসবে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলেই সাধনমুখী মানুষের আপনিই সাধন পাইত, তাই তাঁহার নীরব প্রভাব এ কয়টি জীবনে বড় কম কাজ করে নাই।"

উপেন্দ্রনাথের বর্ণনা হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"......শ্রীঅরবিন্দর জন্য একটা কোণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সমস্ত প্রাতঃকাল তিনি সেইখানের আপনার সাধন-ভজনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। ছেলেরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও কোন কথাই কহিতেন না। অপরাহ্নে দুই-তিন ঘণ্টা পাইচারী করিতে করিতে উপনিষদ্ বা অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন।..."

ইহা হইল—কারাগারের সুবিস্তৃত গৃহে বোমার মামলার ৩৬ জন আসামী একসঙ্গে বাস করার কালের বিবরণ। আদালতে বিচারকালে শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানমগ্ন অবস্থার বর্ণনা করিয়া উপেনবাবু লিখিয়াছেন ঃ

"......এই হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত শ্রীঅরবিন্দ বসিয়া থাকিতেন—তিনি কোন কথাতেই হাঁ বা না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম।...

"...মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না; কিন্তু দেখিতাম যে, শ্রীঅরবিন্দর চুল যেন তেলে চক্‌চক্ করিতেছে! একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি স্নান করিবার সময় মাথায় তেল দেন?' অরবিন্দবাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—'আমি ত স্নান করি না।' জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনার চুল এত চক্‌চক্ করে কি করিয়া?' শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন—'সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের কতকগুলি পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে; আমার শরীর হইতে চুল 'বসা' (Fat) টানিয়া লয়।'

"......ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম যে, শ্রীঅরবিন্দর চক্ষু যেন কাঁচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে, তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে চিত্তের বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে চক্ষে ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই একজনকে তাহা দেখাইলাম; কিন্তু কেহই শ্রীঅরবিন্দকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি সাধন ক'রে কি পেলেন?' শ্রীঅরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটির কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন—'যা খুঁজ-ছিলাম, তা পেয়েছি।' তখন আমাদের সাহস হইল;—আমরা তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলাম। অন্তর্জ্জগতের যে কি অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিলাম, তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম তাহা নহে; তবে এই ধারণাটি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, এই অদ্ভুত মানুষটির জীবনে সম্পূর্ণ একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলের মধ্যে বৈদান্তিক সাধনা শেষ করিয়া তিনি যে সব তান্ত্রিক সাধনা শেষ করিয়াছিলেন, তাহারও কতক কতক বিবরণ শুনিলাম। জেলের বাহিরে বা ভিতরে তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া কখনও আলোচনা করিতে দেখি নাই। এ সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন—'একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্ম শরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান!' মোকদ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—আমি ছাড়া পাইব।

"ফলে তাহাই হইল। মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার এক বৎসর পরে যখন রায় বাহির হইল, তখন দেখা গেল, সত্যসত্যই শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পাইয়াছেন।"

শ্রীঅরবিন্দ ও কর্মযোগিন্

এক

অত্যাচারী বিচারক কিংসফোর্ডকে বধ করিবার জন্য ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যুগান্তর বিপ্লবী দলের অধিনায়কমণ্ডলী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু বিহারের মজঃফরপুর শহরে গমন করেন। ৩০শে এপ্রিল (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ) রাত্রিতে তাহাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় মিসেস্ কেনেডি ও মিস্ কেনেডি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে সেই আঘাতের ফলে মারা যান। পরবর্তী দিবস ১লা মে ক্ষুদিরামকে ঘটনাস্থল হইতে ২৪ মাইল দূরে দুইজন কনস্টবল গ্রেপ্তার করে। ২রা মে মোকামাঘাট স্টেশনে প্রফুল্ল চাকীকে ধরিবার চেষ্টা করিলে তিনি রিভল্‌ভারের গুলীতে আত্ম-হনন করেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামই প্রথম শহীদ।

বোমা নিক্ষেপের ঘটনার দুইদিন পরেই কলিকাতার নানা স্থানে খানাতল্লাসী হয়। ফলে মানিকতলা অঞ্চলের ৩২নং মুরারীপুকুর রোডে বারীনবাবুদের বাগান বাড়ীতে বিপ্লবী দলের বোমার কারখানা ও অস্ত্রাগার আবিষ্কৃত হইল। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উপেন বন্দোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইলেন। ইহা হইতেই ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে বিখ্যাত মানিকতলা বোমার মামলার সৃষ্টি। এই মামলায় শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন প্রধান আসামী। তাঁহাকে সরকার পক্ষ হইতে বিপ্লবী দলের প্রধান নায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আলিপুর দায়রা আদালতে শ্রীঅরবিন্দ সহ ৩৭ জন আসামীর বিচার হইয়াছিল। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেষ্টা, নরহত্যা, বিনা পাসে

অস্ত্রাদি রাখা ইত্যাদি অভিযোগে তাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৎসরাধিক কাল বিচারাধীন আসামী-স্বরূপ কারাবাসের পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে শ্রীঅরবিন্দ এবং আরও কয়েকজন আসামী মুক্তি পাইলেন। শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, ব্যারিস্টার মিঃ সি. আর. দাস—যিনি পরবর্তী কালে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে 'দেশবন্ধু' নামে খ্যাতি লাভ করেন।

দুই

কারামুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ উদ্যমে পুনরায় দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, রাজনীতিক পরিস্থিতি জটিল ও সঙ্কটাপন্ন। লর্ড মিণ্টো তখন ভারতের বড় লাট, আর লর্ড মর্লি ভারত সচিব। স্বৈরাচারী বিদেশী শাসকের নির্যাতন-নীতি প্রবলবেগে চলিতেছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে মধ্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেস যে ভাঙিয়া গেল, তাহার পর তখন পর্যন্তও দুই দলের পুনর্মিলন হয় নাই। প্রকাশ্য বৈধ আন্দোলন এক প্রকার বন্ধ। দমন-নীতির প্রাবল্য সত্ত্বেও বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী দলের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নরমপন্থীদিগকে হাতে করিয়া দমননীতির প্রয়োগ দ্বারা জাতীয়তাবাদী দল ও বিপ্লবী দলকে নিষ্পেষিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হইল মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার। এই তথাকথিত সংস্কারে জনগণকে প্রকৃত রাজনীতিক অধিকার কিছুই দেওয়া হয় নাই। তথাপি মধ্যপন্থীদল ভিক্ষার এই খুদ-কুঁড়ো পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সম্পাদিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন্' ও বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকার মাধ্যমে মৃতপ্রায় রাজনীতিক জীবনে শক্তি সঞ্চারিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। সরকারী দমন

নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া সরকারকে এই বলিয়া সর্তক করিলেন যে, এইরূপ নীতি অনুসৃত হইলে প্রকাশ্য বৈধ আন্দোলন বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ফলে গুপ্ত অবৈধ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তিনি নয়া শাসন-সংস্কারের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, ইহা বিকট ও কৃত্রিম—'monstrous and misbegotten'. অরবিন্দ প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া মধ্যপন্থীদিগের দুর্বলতা ও ভিক্ষুকোচিত মনোবৃত্তির নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদিগণকে পুনরায় সংঘবদ্ধ হইয়া কর্মক্ষেত্রে নামিতে তাঁহার পত্রিকার মাধ্যমে আহ্বান করিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের সতেজ লেখনী কাজ করিতে লাগিল তীক্ষ্ণ কৃপাণের মতো। বিদেশী শাসকমণ্ডলী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাহাদের বংশবদ ভৃত্যেরা ওত পাতিয়া রহিলেন শ্রীঅরবিন্দকে রাজদ্রোহ আইনের বেড়াজালে আটকাইবার জন্য। অবশেষে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের স্বাক্ষরে প্রকাশিত 'টু মাই কান্ট্রিমেন্' ('আমার দেশবাসিগণের সমীপে') শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা মতে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা স্থির হইল।

শ্রীঅরবিন্দ কোন সূত্রে ইহা জানিতে পারিয়া গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইবার পূর্বেই সরিয়া পড়েন। তিনি ব্রিটিশ এলাকা ছাড়িয়া ফরাসী-শাসিত চন্দননগরে যাইয়া স্বনামখ্যাত বিপ্লবী নেতা মতিলাল রায়ের গৃহে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। কিছুকাল তথায় অবস্থানের পর তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা এপ্রিল কলিকাতায় আসিয়া 'ডুপ্লে' নামক জাহাজে চড়িয়া ফরাসী-শাসিত পণ্ডিচারী যাত্রা করেন। শ্রীঅরবিন্দ ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচারী পৌঁছেন এবং তদবধি তিনি তথায় বাস করেন।

তিন

মনোমোহন ঘোষ গ্রেপ্তার হইলেন। কলিকাতায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি. সুইনহো-এর আদালতে তাঁহার বিচার হইল। রাজদ্রোহের মামলায় 'কর্মযোগিন্' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে ফেরারী আসামী বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে বর্ণনা করা হয়। ১৮ই জুন মনোমোহন ঘোষ রাজদ্রোহের অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

আমার দেশবাসিগণের সমীপে—

"এমন তুইটি চূড়ান্ত ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহার ফলে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে নীরবতা ও প্রতীক্ষার ভাব পরিহার করা এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে আর একবার তাহাদের ন্যায্য স্থান গ্রহণ করা অবশ্য-করণীয় হইয়া পড়িয়াছে। এ-যাবৎ শাসন-সংস্কারাবলীকে ভারতে নিয়মতান্ত্রিক প্রগতির নবযুগের সূচনা বলিয়া বেশ ঘটা করিয়া জাহির করা হইয়াছিল ; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাগুলির নিয়মাবলী প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের বুদ্ধি-বিবেচনার নিকট উহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং নির্বাচনের ফলাফল দ্বারা নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলির অপরিহার্য প্রকৃতি ও গঠন প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। একটি সংযুক্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভিতর মধ্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদিগণের মিলনের জন্য মীমাংসার যে কথাবার্তা চলিয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই ; মধ্যপন্থী দলের রাজনীতিক মত ও পথ জাতীয়তাবাদিগণকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, মধ্যপন্থীরা এইরূপ জেদ করায় আপসের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

ভারতে মধ্যপন্থী রাজনীতির উদ্‌বর্তন নির্ভর করিয়াছিল দুইটি বিষয়-বস্তুর উপরে,—প্রতিশ্রুত শাসন-সংস্কারাবলীর অকৃত্রিমতা ও সাফল্য এবং জনসেবার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী দলের কর্মপ্রচেষ্টা কার্যত দাবাইয়া রাখিয়া মধ্যপন্থী মজলিসের সভ্যগণকে (Conventionalists) যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ। মধ্যপন্থী নীতির কার্যকারিতা ও মধ্যপন্থী দলের জীবন্ত শক্তি প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে তাঁহাদের জন্য ক্ষেত্র পরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে। শাসন-সংস্কারাবলীতে সত্যসত্যই যদি নিয়মতান্ত্রিক প্রগতির প্রবর্তন হইত, তাহা হইলে ঘটনাগুলি হইতে মধ্যপন্থী ক্রিয়া-কৌশল কতকটা সমর্থন পাইতে পারিত। কিংবা জনগণের অধিকার লাভের জন্য সতেজ ও সবল আন্দোলন পরিচালনার ক্ষমতা মধ্যপন্থীদিগের আছে বলিয়া কার্যের দ্বারা তাঁহারা যদি প্রমাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেই ক্রিয়া-কৌশলের ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁহারা রাজনীতিক শক্তি হিসাবে তাঁহাদের ক্ষমতা ও সজীবতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। শাসন-সংস্কারাবলী আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে যে, মধ্যপন্থী রাজনীতিতে অবিচলিত থাকিয়া পশ্চাদগমন, নৈরাশ্য ও অবমাননা ব্যতীত আর কিছুই আমরা আশা করিতে পারি না। গত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, মধ্যপন্থীরা (Moderates) জাতীয়তাবাদিগণের (Nationalists) সহযোগিতা আনুকূল্য ভিন্ন বিরোধিতা করিতে এবং সবল আন্দোলন চালাইতে একেবারেই অসমর্থ। তাঁহাদের নেতৃত্বে ভারতের রাজনীতিক জীবন অবসন্ন ও নীরব হইয়া পড়িয়াছে।

অভাবনীয় ঘটনাবলীর অকাট্য যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মশক্তি ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive resistance) নীতিতে মধ্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদীর মিলন হইয়াছিল বলিয়াই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিরাট আন্দোলন

সাফল্য ও শক্তিলাভ করিয়াছিল। সুরাটে বিচ্ছেদের পর এইপ্রকার মিলনের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য সুযোগ-সুবিধা দিবার উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদিগণ হুগলীতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন; এবং সেই সম্মেলনের আর একটি উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মীমাংসার কথাবার্তার এমন কোন সূত্র ও পন্থা খুঁজিয়া বাহির করা,—যাহাতে উভয় দলই সংযুক্ত কর্মপ্রচেষ্টায় সম্মত হইতে পারেন। মিলনের জন্য আমরা হস্ত প্রসারিত করিলেও মধ্যপন্থীরা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। মধ্যপন্থিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলা এবং জাতীয়তা-বাদিগণকে দমন করিয়া রাখা হইল,—লর্ড মর্লির অনুসৃত নীতি, আর মিঃ গোখ্‌লে ও সার্ ফেরোজসা মেটার নেতৃত্বে পরিচালিত মধ্যপন্থী দলের নীতি হইল—মর্লির নীতিকে নির্বিচারে অনুসরণ করিয়া চলা এবং উহার সফলতার জন্য পথ মুক্ত করিয়া রাখা ও সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া। এই মিলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে; মধ্যপন্থীরা যে ভিক্ষুকোচিত পুরস্কার পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নগণ্য ও ন্যূন জনপ্রিয় সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁহাদের রাজনীতিক মত ও নিয়মতন্ত্র গ্রহণের জন্য জেদ প্রকাশের দ্বারা তাঁহারা আপন দেশবাসিগণের সহিত মিলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থার যাবতীয় উদ্দেশ্য এবং উহার সমর্থনযোগ্য রাজনীতিক কারণ লোপ পাওয়া সত্ত্বেও সেই পথ অনুসরণ করিয়া চলাই মধ্যপন্থিগণের অভিপ্রায়। গভর্নমেণ্ট কর্তৃক বিড়ম্বিত এবং অবমানিত হইয়াও তাঁহারা নিজেদের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না; কিংবা লর্ড মর্লির প্রদত্ত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যে ভারতীয় জনগণকে তাঁহারা বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন, উহাদিগকেও কোন পরিষ্কার এবং যুক্তিসঙ্গত উপায় বলিয়া দিতে পারিতেছেন না।

মধ্যপন্থী মজ্‌লিস (Convention) দেশের জাতীয়তাবাদের

বিপুলায়তন মনোভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, সংস্কারোত্তর ব্যবস্থাপক সভাগুলির নির্বাচক-মণ্ডলীর ন্যায় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নির্বাচক-মণ্ডলী গঠনের দ্বারা জনপ্রিয়তা ও শক্তিলাভের দ্বারগুলি ইচ্ছা করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে; এবং যে নীতি দারুণ দুর্যোগের দিকে চালিত করিয়াছে তাহাতেই অবিচলিত থাকিয়া ইহা আত্ম-বিনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে; ফলে অবসাদ এবং জনগণের ঔদাসীন্য, অবজ্ঞা ও বিরোধিতার দরুন এই মধ্যপন্থী মজ্‌লিসের ধ্বংস অনিবার্য। জাতীয়তাবাদিগণ যদি এখন সরিয়া পড়েন, তবে হয় জাতীয় আন্দোলন লোপ পাইবে, অথবা তাঁহাদের পরিত্যক্ত স্থান অন্যায় ও হিংসাত্মক কার্য দ্বারা পূর্ণ হইবে। দেশের উন্নয়ন-প্রয়াসী ও মুক্তি-কামী ব্যক্তিগণ এই দুইটি অবস্থার কোনটিই বরদাস্ত করিতে পারিবেন না।

প্রতীক্ষা করার কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। দুইটি বিষয় আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে; প্রথমত জাতির ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে, এবং দ্বিতীয়ত ইহা গড়িয়া তুলিবার জন্য আমরা মধ্যপন্থী দলের নিকট হইতে কোন প্রকার আন্তরিক সহযোগিতা আশা করিতে পারি না। আমাদের যাহা করণীয়, তাহা আমাদিগকে নিজের শক্তি ও সাহসেই করিতে হইবে। তাহা হইলে আসুন আমরা সাহসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিগণের মতো এই ভগবদ্দত্ত কার্যে আত্মনিয়োগ করি; এবং কার্য-সাধনার্থ বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিতে ও মহাসংকটের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত থাকি; কেননা আমাদের ব্রতও মহান্। এমন কেহ যদি থাকেন, যাঁহারা নির্যাতনের ভয়ে সাহস হারাইয়াছেন, তাঁহারা একপার্শ্বে সরিয়া থাকুন। এমন কেহ যদি থাকেন, যাঁহারা মনে করেন যে, য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ার তোষামোদের দ্বারা কিংবা ইংরাজী উদারনীতিকতার (English Ciberalism) সঙ্গে কপট প্রণয়ের অভিনয় করিয়া প্রচেষ্টার আবশ্যকতা এবং বিপদের অনিবার্যতা পরিহার করিতে

পারেন, তাঁহারা একপার্শে সরিয়া থাকুন। এমন কেহ যদি থাকেন, যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর লাভ কিংবা অসার অনুগ্রহের দানে তুষ্ট থাকিতে প্রস্তুত, তাঁহারা এক পার্শ্বে সরিয়া থাকুন। কিন্তু যাঁহারা জাতীয়তাবাদী নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, তাঁহাদের সকলকে অবশ্যই সাড়া দিতে হইবে এবং নিজ নিজ কর্তব্যভার বহন করিতে হইবে।

আইনের ভীতি তাহাদের জন্যই, যাহারা আইন ভঙ্গ করে। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ ও ন্যায়সঙ্গত, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয়, আমাদের পন্থা শান্তিপূর্ণ, কিন্তু অবিচলিত ও নির্ভীক। আমরা আইন ভঙ্গ করিব না, সুতরাং আইনকে আমাদের ভয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু কলুষিত পুলিশ, অবিবেকী রাজকর্মচারী কিংবা একদেশদর্শী বিচার-আদালত যদি অবৈধ রাজ-অনুজ্ঞা, উৎকোচ দানে সংগৃহীত মিথ্যা সাক্ষ্য অথবা অন্যায় সিদ্ধান্তের দ্বারা পুরোবর্তী ব্যক্তিগণকে হয়রান করিবার জন্য আমাদের রাজনীতিক কর্মধারার ন্যায়সঙ্গত প্রচারের সুবিধা গ্রহণ করেন,—তাহা হইলে স্বাধীনতার অভিযানে আমাদের অবশ্য-দেয় শুল্ক প্রদান করিতে আমরা কি সঙ্কুচিত হইব? আমরা কি তুচ্ছ গোপনীয়তা কিংবা অপমানজনক নিষ্ক্রিয়তার পশ্চাতে ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিব? আমাদের সভাসমিতি, আমাদের সঙ্ঘ-সংস্থা, আমাদের প্রচার-পদ্ধতি—সমুদয় আমাদের রাখিতেই হইবে; আর যদি নিরঙ্কুশ ঘোষণাবলীর দ্বারা এই সমস্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য আমরা সম্পাদন করিলাম, এবং সেই উন্মত্ততার কোন প্রকার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তিবে না—যাহা ভারতের ভিতরে ও বাহিরে আমাদের মধ্যে অভ্যুত্থিত ভয়ংকর-ভাবে উদ্যমশীল ও বিবেকহীন শক্তিসমূহের হাতের মধ্যে একটি হতাশ ও রুষ্ট নির্বাক জাতিকে ফেলিয়া দিয়া প্রকাশ্য ও বৈধ রাজনীতিক কর্ম-প্রচেষ্টাকে নিষ্পেষিত করিয়া দেয়। শান্তি-

পূর্ণ কর্ম-প্রচেষ্টার জন্য কোন প্রকার সামান্য পথও যদি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা সংগ্রাম পরিহার করিব না। যদি অবস্থা সঙ্গিন ও প্রায়-অসাধ্য করিয়া তোলা হয়, তবে টান্সভালে আমাদের দেশবাসিগণকে যে অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইতেছে, তদপেক্ষাও কি তাহা অপকৃষ্ট হইতে পারে? কিংবা আমরা—ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট অংশ—সেই শ্রমজীবী এবং দোকানীদের অপেক্ষাও কি কম সামর্থ্য ও আত্মোৎসর্গ দেখাইব, যাহারা স্বসম্প্রদায়ের কল্যাণ এবং স্বজাতির মর্যাদার জন্য তথায় প্রসন্ন-চিত্তে দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে?

আমাদের প্রচেষ্টা কিসের জন্য? পূর্ণাঙ্গ আত্মবিকাশ আমাদের লক্ষ্য। অধিকতর দূরবর্তী লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রাথমিক সোপান-স্বরূপ আমাদিগকে ইত্যবসরে অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল অবস্থায় যেরূপ ত্রুটিপূর্ণ আত্মোন্নতি এবং অসম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ সম্ভব, তাহাই লাভ করিতে হইবে। আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা এই যে, আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়া কিংবা দেশের আইনের দ্বারা আমাদের জন্য প্রদত্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া স্বায়ত্ত-শাসন বিবর্তিত করিয়া তোলা। পরিচালন করিবার মতো কতক পরিমাণ শাসন-ক্ষমতা ব্যতীত শেষোক্ত উপায়ে এইরূপ বিবর্তন সম্ভব নহে। সুতরাং এই সদ্য-প্রবর্তিত বিকট ও কৃত্রিম পরিকল্পনা চাহি না; কিন্তু আমরা চাহি, লর্ড মর্লির শাসন-সংস্কারাবলীতে যে গণতান্ত্রিক নীতি উপেক্ষিত হইয়াছে সেই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটা সংস্কার, ধর্ম জাতি বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে গঠিত লেখাপড়া-জানা একটা নির্বাচক-মণ্ডলী, বর্জন-ক্ষমতাযুক্ত, বিধান হইতে মুক্ত স্বাধীনতা, আইন-প্রণয়ন ও আর্থিক ব্যাপারে এবং স্বৈরাচারী শাসন-বিভাগীয় কর্মচারী-মণ্ডলকে কতকটা নিয়ন্ত্রণ করিবার মতো কার্যকরী ক্ষমতা। সরকারী শাসন-বিভাগকে আমলাতন্ত্রের হস্ত হইতে জনগণের হস্তে ক্রমশঃ

হস্তান্তরিত করাও আমাদের দাবী। যে পর্যন্ত না এই সমুদয় দাবি পূরণ হয়, সে পর্যন্ত…আমরা সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিয়া চাপ দিব এবং ইহারই নাম 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'। আমরা সেই চাপ দিব আইনের সীমার মধ্যে থাকিয়া; কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার কথা বাদ দিলেও কতদূর পর্যন্ত আমরা ইহার প্রয়োগ করিব, তাহা নির্ভর করে অবস্থানুযায়ী ঔচিত্যের উপর এবং যে পরিমাণ প্রতিরোধ আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে তাহার উপর।

আমাদের নিজেদের পক্ষে সমাধান করিবার জন্য বড় ও জরুরী সমস্যাগুলি রহিয়াছে। জাতীয় শিক্ষা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে নৈতিক উদ্দীপনা ও আর্থিক সাহায্য না পাইয়া, এবং এরূপ বন্ধন-মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির অভাবে, যাহা ইহার সংহতি ও পথের বিঘ্নগুলিকে অপসারিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ও নির্ভয়। যে সালিসের আন্দোলন প্রারম্ভে সফল হইয়াছিল, তাহা নির্যাতনের ফলে স্থগিত রাখা হইয়াছে। স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জনের আন্দোলন স্বীয় বেগবলে অদ্যাবধি চলিতেছে; কিন্তু অগ্রগতির এখন আর সেই দ্রুততা এবং বলিষ্ঠ সংকল্পের সংহত অনিবার্যতা নাই, যাহা ইহাকে সম্মুখের দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। সামাজিক সমস্যাসমূহ আমাদিগকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে এবং এই-গুলিকে আমরা আর অবহেলা করিতে পারি না। আমাদের দেশে গত শতাব্দীতে উপেক্ষিত জ্ঞানের সংগঠন-ভার আমাদিগকে অবশ্যই লইতে হইবে। সর্বনাশা ব্যয়বহুল বৃটিশ আদালতে মামলা-বাজির শয়তানী আশ্রয় হইতে আমাদের সামাজিক এবং অর্থ-নীতিক উন্নয়নকে নির্মুক্ত করিতে হইবে। শিল্প-সম্পর্কিত স্বাধীনতা এবং অর্থনীতিক প্রাচুর্যের অভিমুখে আন্দোলনকে পরিচালিত করিবার জন্য আমাদিগকে আর একবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই সমুদয় হইল আমাদের উদ্দেশ্য,—যাহার জন্য ভারতের

জাতীয় শক্তিকে সংহত করা আবশ্যক। আমাদের উপরই কার্যভার ন্যস্ত হইয়াছে, একমাত্র আমাদের মধ্যে সেই নৈতিক উৎসাহ বিশ্বাস ও ত্যাগের ইচ্ছা রহিয়াছে,—যাহা কার্য সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিতে এবং অনেক দূর পর্যন্ত যাইতে পারে। এইজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় দলকে সংঘবদ্ধ করিয়া তোলা। দেশের সমস্ত বৃহৎ কেন্দ্র-গুলিতে কার্যভার লইবার জন্য এবং জাতীয়তাবাদিগণের কর্ম-তৎপরতা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে উপায় নির্ধারণার্থ যে সকল নেতা শীঘ্রই সম্মিলিত হইবেন, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আমি সেই দলকে অনুরোধ জানাইতেছি। জাতীয়তাবাদিগণের একটি পরিষদ স্থাপন এবং আগামী বৎসরের মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে দলের একটি সভার অধিবেশন বাঞ্ছনীয়। দেশের সর্বত্র জাতীয়তা-বাদী সমিতির প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক। এই সমস্ত কার্য যখন সমাধা করিব, তখনই আমরা আমাদের কার্যক্রম প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতে এবং ভারতের রাজনীতিক জীবনে আমাদের উপযুক্ত স্থানে বসিতে সমর্থ হইব।

চার

ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে শুনানিকালে প্রবন্ধ-লেখকের অভিপ্রায় বা Intention প্রমাণের জন্য তাঁহার লিখিত ও 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত এই শ্রেণীর আরও তিনটি প্রবন্ধ দাখিল করা হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলির নাম ও প্রকাশের তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) 'The doctrine of Sacrifice'—ত্যাগের নীতি (১৯০৯—২৪শে জুলাই); (২) 'In open letter to my countrymen'—আমার দেশবাসিগণের নিকট একখানা খোলা

চিঠি (১৯০৯—৩১শে জুলাই) ; (৩) 'Nationalist Organization'—জাতীয়তাবাদী সংগঠন (১৯০৯—২রা অক্টোবর)।

এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যদিও অভিযোগ সংক্রান্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায়, তথাপি পরবর্তী বৎসরের ২রা এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত কোন অভিযোগ আনা হয় নাই।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মনোমোহনের পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করা হইল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর বিচারপতি হোমউড্ ও বিচারপতি ফ্লেচারের আদালতে আপিলের শুনানী হয়। আপিলকারীর পক্ষে ছিলেন মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জী ব্যারিস্টার এবং তৎসঙ্গে বাবু মন্মথ মুখার্জী উকিল ; আর সরকার পক্ষে ছিলেন মিঃ কেন্‌রিক (কে. সি.) য়্যাড্‌ভোকেট জেনারেল এবং তৎসঙ্গে মিঃ অর্. ডেপুটি লিগাল রিমেম্‌ব্র্যোন্সার। মিঃ চ্যাটার্জী নিম্ন আদালতের রায় এবং অভিযোগ সম্পর্কিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া শুনাইলে পর বিচারপতি হোমউড্ বলেন :

"আমরা য়্যাড্‌ভোকেট জেনারেলকে প্রথমে জবাব দিবার জন্য আহ্বান করিব।—প্রবন্ধে আমরা কোন উত্তেজনা কিংবা বিদ্বেষ দেখিতে পাইতেছি না ; সরকারের উপর আক্রমণও দেখি না।"

পাঁচ

তখন সরকারী কৌঁসিলী (য়্যাড্‌ভোকেট জেনারেল) সওয়াল জবাব করিতে উঠিয়া প্রথমে রাজদ্রোহের ধারাটি পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং বলিলেন,—প্রবন্ধের বহু অংশ এবং প্রবন্ধটিকে

সমগ্রভাবে ধরিলেও যে উহা বিদ্বেষের উত্তেজনা দানে উন্মুখ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিচারপতি হোমউড্ জিজ্ঞাসা করেন: স্বৈরাচার সরকারের কাছে যদি পূর্ণ শাসন-সংস্কার চাওয়া হয়, তাহা হইলে কি উহাকে রাজদ্রোহাত্মক বলা যায়?

বিচারপতি ফ্লেচার: লেখক কি বলিতে পারেন না ইহা খাঁটি নিয়মতান্ত্রিক শাসন-সংস্কার নহে?

স-কোঁ: কিন্তু লেখক যখন বলিতেছেন যে, ইহা বিকট ও কৃত্রিম শাসন-সংস্কার, তখন গভর্নমেণ্টের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে।

বিচারপতি হোমউড্: এরূপ একটি সন্তানকে অঙ্গ-বৈকল্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা বিকলাঙ্গ। ইহা কি রাজদ্রোহাত্মক?

স-কোঁ: যে সকল ঘটনার ফলে প্রধানত মধ্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদিগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, লেখক সর্বপ্রথম তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; এবং তারপর তাঁহার দেশবাসিগণকে বলিয়াছেন যে, মধ্যপন্থী নীতি অপমানজনক অবস্থা আনিয়াছে, তাহা বর্জনীয়।

বিচারপতি ফ্লেচার: লেখক মধ্যপন্থীদলের অবমাননার কথাই বলিতেছেন।

স-কোঁ: এইরূপ বলা কি আইন-সঙ্গত? অবমানিত হইয়াছেন, এইরূপ বলা কি ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে?

বিচারপতি ফ্লেচার: আপনি কি বলিতে পারেন না যে, গভর্নমেণ্টের কার্যে অমুক আর অমুক অবমানিত হইয়াছে?

স-কোঁ: এইরূপ বলা কি আইন-সঙ্গত? ইহাতে কি অসন্তোষের উস্কানি দেওয়া হয় না? বিষয়টি সাধারণভাবে দেখিবার জন্য আমি মহামান্য আদালতকে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিচারপতি ফ্লেচার: আপনার যুক্তি হইল এই যে, শাসন-সংস্কারের কোন প্রকার সমালোচনা করা বৈধ নহে।

অতঃপর আদালত এবং সরকার পক্ষের কৌঁসিলীর মধ্যে তর্কবিতর্ক চলে—কলুষিত পুলিশ (Corrupt police), অবিবেকী রাজকর্মচারী (Unscrupulous officials), একাদেশদর্শী বিচারাদালত (Partial judiciary) প্রভৃতি মন্তব্য লইয়া। সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ঐ সকল মন্তব্যের দ্বারা আইনত প্রতিষ্ঠিত সরকারকে আক্রমণ করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে বিচারপতি ফ্লেচার প্রশ্ন করেন: পুলিশ কি করিয়া আইনত প্রতিষ্ঠিত সরকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে?

সরকারী কৌঁসিলী জবাবে বলেন যে, সরকারী কর্মচারীরা সরকারের একটা অংশ, কাজেই তাঁহারাও সরকার বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

বিচারপতি হোমউড্ মন্তব্য করেন: চৌকিদারও কি দেশের সরকার?

জবাবে সরকারী কৌঁসিলী বলেন: ইহারা শাসন শক্তির শাখা।

ছয়

এইভাবে চেষ্টা করিয়াও সরকারী কৌঁসিলী যখন বিচারপতি-দ্বয়কে প্রবন্ধটি আইনবিরুদ্ধ বলিয়া বুঝাইতে পারিলেন না, তখন একান্ত নিরুপায় হইয়াই অন্যায়-ভাবে বলিলেন যে,—আসামী মনোমোহন ঘোষ কুখ্যাত 'নবশক্তি' পত্রিকার রাজদ্রোহের মামলায় একবার দণ্ডিত হইয়াছিলেন। মনোমোহন দণ্ডিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৌঁসিলীর বিচারাদালতকে এই ক্ষেত্রে

তাহা অবগত করানো অন্যায় ও অসঙ্গত হইয়াছে। এইসঙ্গে কৌঁসিলী ইহাও বলেন: লেখক বলিয়াছেন, 'যদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান না করি, তবে ইহা লোপ পাইবে এবং হিংসাত্মক কার্যের দ্বারা সেই শূন্য স্থান পূরণ হইবে।' ইহার দ্বারা নিঃসন্দেহে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে।

বিচারপতি ফ্লেচার: আমি আপনার যুক্তি বুঝিতে পারিতেছি না। লেখক কোনো প্রকার ভয় প্রদর্শন তো করিতেছেন না।

সরকারী কৌঁসিলী: ইহা যে ভয় প্রদর্শন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং এই ভয় প্রদর্শন এমন ব্যক্তি করিতেছেন, যাঁহার সহোদর ভ্রাতা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বিচারপতি ফ্লেচার: তাহা আমরা কিছুতেই বিবেচনার মধ্যে আনিব না। ইহা নথিপত্রের বহির্ভূত বিষয়। আমরা এই কথাটাই বিবেচনার মধ্যে আনিব যে, লেখক সেই মামলায় মুক্তি পাইয়াছেন, যেহেতু দায়রা জজ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত একমাত্র সাক্ষ্য বিশ্বাস করেন নাই।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক মনোমোহন ঘোষের কারাদণ্ডের নথিপত্র বহির্ভূত কথাও ইতিপূর্বে বিচার-আদালত সরকারী কৌঁসিলীর মুখে নিঃশব্দে শুনিয়াছেন। তবু কোন মন্তব্য করেন নাই। কিন্তু সরকারী কৌঁসিলী পুনরায় যখন সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের প্রসঙ্গ সেইভাবেই বিচার-আদালতের গোচরে আনিলেন, তখন বিচারপতি ফ্লেচারের কাছ হইতে তাঁহাকে ঐরূপ কঠোর মন্তব্য শুনিতে হইল। কৌঁসিলী সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলাইয়া বলিলেন: বিচার-আদালতের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে আমি সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি না, কিন্তু ইহা যে ইতিহাসের বিষয়।

অতঃপর কৌঁসিলী নিম্ন আদালতে সরকার পক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ

দাখিলী শ্রীঅরবিন্দের অপর তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলেন: এই প্রবন্ধটিতে লেখক বলিতেছেন,—আমাদের স্বরাজের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা—বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।

বিচারপতি ফ্লেচার: যিনি প্রবন্ধের লেখক, সেই ভদ্রলোকের মতে এই শাসন-সংস্কার গ্রহণযোগ্য নহে।

সরকারী কৌঁসিলী: তাঁহারা 'বয়কট' প্রয়োগের জন্য বলিতেছেন এবং ইহাতে সরকারের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

বিচারপতি ফ্লেচার: স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে। ইহার দ্বারা সরকারকে বয়কট করা বুঝায় না।

সরকার পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইলে বিবাদী পক্ষের কৌঁসিলী মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জী জবাবে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করেন।...তিন দিনে আপীলের শুনানি শেষ হইল।

বিচারপতিদ্বয় একমত হইয়া ৭ই নভেম্বর রায় দিলেন। শ্রীঅরবিন্দের লিখিত অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধটি রাজদ্রোহাত্মক নহে বলিয়া আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত হইল। নিম্ন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ উচ্চতম আদালত বাতিল করিয়া দেওয়ায় মনোমোহন ঘোষ মুক্তি পাইলেন।

বিচারপতিরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে,—শাসন-সংস্কার ও সরকারের অপরাপর ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করা এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও বিদেশী-বয়কটের প্রসঙ্গ অবতারণা করা রাজদ্রোহাত্মক হয় নাই।

অরবিন্দের অজ্ঞাতবাস

এক

স্বদেশী আন্দোলনের তিন বৎসর পূর্ণ না হইতেই বিহারের মজঃফরপুর শহরে সাহেবদের ক্লাবের প্রবেশ-দ্বারে রাত্রির অন্ধকারে বোমা ফাটিল। সে বোমা ভীষণ! শত্রু-নিধনে মৃত্যুঞ্জয় দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বাঙ্গালী যুবকের দুঃসাহসিক অভিযান। বহু রাজনীতিক মামলার বিচারক কাজী কিংস্‌ফোর্ড—যিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের পঞ্চদশবর্ষীয় ছাত্র সুশীল সেনকে বর্বরোচিত বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই—তিনিই ছিলেন আক্রমণের লক্ষ্য। ঘটনাচক্রে, লক্ষ্য নির্ণয়ের ভুলে, নিহত হইলেন দুইজন ইংরেজ মহিলা।

এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল, ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই বৈশাখ। পরদিন পুলিসের হস্তে বন্দী হইল ক্ষুদিরাম বসু। তারও পরের দিন (২রা মে) প্রফুল্ল চাকী শত্রু-হস্তে বন্দী আসন্ন বুঝিয়া পর পর দুইবার রিভল্‌ভারের গুলী ছুড়িয়া আত্মহনন করিল। সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় ব্যাপক খানাতল্লাশী চলে। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও ভ্রাতৃগণের মানিকতলা বাগানে বোমা নির্মাণের কারখানা ও অস্ত্রাগার আবিষ্কৃত হয়। শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্র তাঁহার কয়েক জন সতীর্থ সহ গ্রেপ্তার হইলেন। যুগান্তর বিপ্লবী দলের অধিনায়ক সন্দেহে শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলেন গ্রে স্ট্রীটের একটি বাড়ী হইতে। আলিপুরের সেস্‌ন জজের আদালতে বিচার হইল। কিঞ্চিদধিক এক বৎসরকাল বিচারাধীন আসামী-স্বরূপ কারাবাসের পর শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন।

কারামুক্তির মাসাধিক কাল পরেই (১৯০৯ সালের মধ্যভাগে)

শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইল ইংরাজী সাপ্তাহিক "কর্মযোগিন্" এবং বাংলা সাপ্তাহিক "ধর্ম"। এই দুইখানি পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ জাতিকে শুনাইতে লাগিলেন নব নব বাণী, দেশের সম্মুখে দিলেন নূতন কার্যক্রম। কারাবাসের কঠোরতা তাঁহার দেহ-মনের উপর কোন প্রতিকূল ও অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বিস্তার করিতে তো পারেই নাই, বরং অগ্নিদগ্ধ হইয়া সুবর্ণ যেমন শ্যামিকা-শূন্য হয়, তেমনই তিনিও তপোনির্মল এবং সাধনশুদ্ধ নবজীবন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। কারাগারের নির্জন ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষের বন্দী-জীবন হইতে তিনি লইয়া আসিলেন নারায়ণ-দর্শন-ধন্য ধ্যান-পূত মুক্ত জীবনের জ্যোতির্ময় আলোক-ধারা। তাঁহার ভাষণ ও রচনার মধ্য দিয়া সেই আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল। মুক্তি-তীর্থযাত্রী সেই আলোকে সন্ধান পাইল নূতন পথের।

জাতীয়তাবাদী দলের মুখপাত্র ভারত-বিশ্রুত ইংরেজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদনা-কালে শ্রীঅরবিন্দের লেখায় রাজনীতির কথাই বেশী থাকিত। দেশের তৎকালীন রাজনীতিক পরিস্থিতিতে ঐরূপ রচনার প্রয়োজনও ছিল যথেষ্ট। শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি ধর্মবর্জিত নহে। তিনি দেশ-সেবাকে ভগবৎসেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়াই জানিতেন। স্বদেশ তাঁহার দৃষ্টিতে জড়পদার্থ নহে—জাগ্রত জীবন্ত দেবী, পরমারাধ্যা জননী। শ্রীঅরবিন্দ বলেন— ... "অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?"

এইভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলিয়াই তিনি স্বদেশের দাসত্ব-

মোচনের কাজকে মনে করিতেন রাক্ষস কবলিত বন্দিনী জননীর উদ্ধার-কার্য।

"বন্দে মাতরম্"-এর লেখা হইতে পরবর্তী কালের "কর্মযোগিন্" এবং "ধর্ম" পত্রিকার লেখায় পার্থক্য ছিল এই যে, শেষোক্ত পত্রিকা দুইখানিতে ধর্মতত্ত্ব প্রাধান্য পাইয়াছিল। কিন্তু সেজন্য এরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে যে, তাহাতে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাতিকতার কথা বাদ পড়িত, কিংবা রাজনীতির কথা এবং স্বদেশের দাসত্ব-মুক্তির কথা গৌণ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকিত।

দুই

কারামুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, দেশের তৎকালীন রাজনীতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লর্ড মর্লি ভারতের বড়লাট। ?? স্বৈরাচারী বিদেশী শাসকের দমন-নীতির প্রয়োগ চরমে উঠিয়াছিল। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে দক্ষ-যজ্ঞের পালার পর মধ্যপন্থী দল (Moderate party) এবং জাতীয়তাবাদী দলের (Nationalist partyর) পুনর্মিলন হয় নাই। প্রকাশ্য বৈধ আন্দোলন একেবারে বন্ধ। মধ্যপন্থী নেতাদের মধ্যে অনেকেই ভয়ে এক প্রকার নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। দমন-নীতির প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীদের সন্ত্রাসমূলক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার বেশ ঘটা করিয়াই প্রবর্তিত হইল। এই সংস্কার প্রবর্তনের মূলে দুইটি কূটনৈতিক অভিসন্ধি ছিল। একটি, তথাকথিত রাজনীতিক অধিকার দানের মধ্য দিয়া মধ্যপন্থীদের তোষণ ও হাত করা, আর অপরটি হইল এই দলকে হাত করিয়া জাতীয়তাবাদী দল ও বিপ্লববাদী দলকে দমন-নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগ দ্বারা নিষ্পেষিত করা।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সাপ্তাহিক পত্র দুইখানির সাহায্যে অবসন্ন জাতীয় জীবনকে সজীব করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইলেন। সরকারী দমন-নীতির বিরুদ্ধে তিনি জ্ঞাপন করিলেন নির্ভীক প্রতিবাদ এবং বিদেশী শাসকমণ্ডলীকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে, এইরূপ নীতি অনুসৃত হইতে থাকিলে প্রকাশ্য বৈধ আন্দোলন বন্ধ হইয়া যাইবে এবং গুপ্ত অবৈধ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তিনি নয়া শাসন-সংস্কারের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, উহা বিকট ও কৃত্রিম—"monstrous and misbegotten." তিনি মধ্যপন্থী দলের ভিক্ষুকোচিত মনোবৃত্তি ও দৌর্বল্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন ; এবং জাতীয়তাবাদী দলকে সাহসিকতার সহিত কর্মক্ষেত্রে নামিয়া দেশের ওই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কার্যভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের রচনায় ও ভাষণে মধ্যপন্থী দলের লোকেরা তো চটিলেনই, আর এদিকে বিদেশী শাসকমণ্ডলীও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে "কর্মযোগিন্" পত্রিকায় ১৯০৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় "অরবিন্দ ঘোষ" স্বাক্ষরে প্রকাশিত To my countrymen (আমার দেশবাসীগণের সমীপে) শীর্ষক প্রবন্ধের সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা স্থির হয়। আদালতে অভিযোগ দাখিল এবং গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা বাহির হইবার পূর্বেই তিনি সরকার পক্ষের প্রস্তুতির কথা জানিতে পারেন। গোয়েন্দা-পুলিসের নজরবন্দী শ্রীঅরবিন্দ ছদ্মবেশে প্রহরারত পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিয়া গেলেন বৃটিশ এলাকা ছাড়িয়া ফরাসী-শাসিত চন্দননগরে। অকস্মাৎ শ্রীঅরবিন্দ নিরুদ্দেশ হইয়াছে দেখিয়া পুলিস তাঁহার সন্ধানে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল ; কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান মিলিল না।

তিন

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর গমনের বিবরণ সংক্ষেপে এই :

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। রাত্রি আটটার সময় শ্রীঅরবিন্দ অন্যান্য দিনের মতো "কর্মযোগিন্" ও "ধর্ম" পত্রিকার কার্যালয়ে (৪নং শ্যামপুকুর লেনে) ছিলেন। সেই সময় "ধর্ম" পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সহকারী ও যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মী রামচন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার গ্রেপ্তার আসন্ন। একজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামবাবুকে যে এই সংবাদ দিয়াছেন, তাহাও তিনি (রামবাবু) জানাইলেন। সংবাদ শুনিয়া শ্রীঅরবিন্দ সামান্য একটু ভাবিয়া নিয়াই বলিলেন যে, তিনি এখনই চন্দননগর রওনা হইবেন এবং অগৌণে যেন সে ব্যবস্থা করা হয়। রামবাবু তখন শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া অলি-গলির মধ্য দিয়া বাগবাজারে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছেন। সঙ্গে ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। রামবাবু একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া আসেন। চন্দননগর যাত্রার সহযাত্রী হইলেন সুরেশবাবু (মণি) ও বীরেনবাবু।

পরদিন প্রত্যুষে তাঁহারা চন্দননগর পৌঁছেন। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রয় চাহিয়াছিলেন তাঁহার পরিচিত বন্ধু, আলিপুর বোমার মামলায় সহ-কারাবাসী এবং মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের নিকট। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরিত লোকের মারফতে তিনি অসম্মতি জানাইয়া পাঠান। চন্দননগরে বিপ্লবী নেতা (পরবর্তী কালে বিখ্যাত জন-প্রতিষ্ঠান প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি) মতিলাল রায় কোন বন্ধুর মুখে এই প্রত্যাখ্যানের কথা জানিতে পারিয়া সোজাসুজি চলিয়া গেলেন গঙ্গাতীরে নৌকা-ঘাটে। শ্রীঅরবিন্দের নৌকা খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আনেন এবং সশ্রদ্ধ-সমাদরে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন।

প্রবন্ধ-লেখকের নিকট এই সম্পর্কে লিখিত মতিবাবুর একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে পৌঁছেন সরস্বতী পূজার পরদিন। এই দিবসটি শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এবং প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য মতিলালের জীবনে একটি স্মরণীয় দিবস। ওই দিনটিতে আরম্ভ হয়—শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে অজ্ঞাতবাস, আর মতিলালের আধ্যাত্মিক জীবনে বিস্ময়কর পরিবর্তন! এই কথা বলিলে সম্ভবতঃ ভুল হইবে না যে, চন্দননগরে অজ্ঞাতবাসেই রচিত হইয়াছিল শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীর আশ্রম-জীবনের পটভূমিকা।

চার

কি ভাবে কি অবস্থায় ওই মহান্ অতিথিকে মতিলাল তাঁহার বোড়াইচণ্ডীতলার বাসভবনে আনিয়া রাখিলেন, সে কাহিনী এখন পাঠকপাঠিকারা শুনিবেন মতিলালের মুখেই ঃ

"একদিন প্রাতঃকালে—মাঘ মাসের শেষাশেষি হইবে, জলযোগ করিয়া কর্মস্থানে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে আমার এক বন্ধু তাড়াতাড়ি আমায় আড়ালে ডাকিয়া বলিল,—শুনেছ, এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে! আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম—তখন কাণ্ড অর্থে বৈপ্লবিক বীভৎস কোন ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। তাহা ছাড়া, সম্প্রতি কলিকাতার উচ্চ আদালতে সামসুল হুদা নামক জনৈক উচ্চতম পুলিস কর্মচারী নিহত হইয়াছিলেন; আবার যে কি কাণ্ড বাধিল, সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠ হইলাম। বন্ধু বলিল, শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে আসিয়াছেন, এতক্ষণ হয়তো চলিয়া গিয়াছেন;—বড় খারাপ হইল।

"আমি রহস্য বুঝিলাম না, ভাবিলাম—কোন উদ্দেশ্য লইয়া হয়তো আসিয়া থাকিবেন, পুনরায় চলিয়া যাওয়ায় মন্দ হইবার কারণ কি? কিন্তু বন্ধু এক নিঃশ্বাসে যাহা বলিলেন, তাহাতে

বুঝিলাম—শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা হইতে, পলাইয়া আসিয়াছেন; তিনি যাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় হয়তো ফিরিয়া গিয়া থাকিবেন।

"শুনিলাম, ভোর চারটায় তিনি তাঁর পরিচিত বন্ধুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। তখন প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমার সহিত শ্রীঅরবিন্দের কোনরূপ পরিচয় ছিল না; তবে তাঁর নাম শুনিয়াছিলাম এবং হুগলী প্রাদেশিক সভায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষও করিয়াছিলাম। আলিপুর বোমার মকদ্দমায় তাঁর কথা হৃদয়ের দরদ দিয়া শুনিতাম, পড়িতাম; 'বন্দে মাতরম্' কাগজে তাঁর লেখা বাহির হয়, এই জন্য উহা আগ্রহসহকারে পাঠ করিতাম। অরবিন্দের ত্যাগ ও তপস্যার কথা সর্বজনবিদিত হইয়াছিল। আলিপুর জেল হইতে তিনি ফিরিয়া যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে অভিনব বস্তু ছিল। ভারতের প্রাণের কথা যেন তাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। বিশেষতঃ, তিনি তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবীকে যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্বদেশপ্রেমের যে অমৃতধারা ঝরিয়াছিল, তাহা হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়াছিল। দেশকে এমন করিয়া কেহ বুঝি ভালবাসিতে পারে না; দেশের মুক্তি এই মহাপুরুষের তপস্যাবলেই যে আসিবে—এ ধারণাও বদ্ধমূল হইয়াছিল। সে অনেক কথা, ইহার পরও এই বিষয় লইয়া অনেক লিখিতে হইবে—উপস্থিত তাঁর খ্যাতি ও চরিত্র-কথার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ঘটনার কথাই বলি।

"আমি বলিলাম, 'এতক্ষণ যে থাকিবেন, মনে হয় না। তবে তিনি কি ভাবে আসিয়াছিলেন?' বন্ধুর মুখে শুনিলাম, 'নৌকা করিয়াই আসিয়াছিলেন; একজন যুবকের মাধ্যমে কথাটা পাঠাইয়াছিলেন—আমি প্রতিদিন প্রভাতে সেখানে চা খাইতে যাই, তাই শুনিলাম।'

"আমি বিদ্যুদ্বেগে গঙ্গার ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বসা

প্রথম পদসঞ্চারে শীতের কুহেলী কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষীণধারা তরঙ্গিণী প্রভাত-সমীরে দুলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তখন পূর্ব গগনের মেঘমালা বিদীর্ণ করিয়া সূর্য প্রকাশ হয় নাই। অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষতল দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলাম।

"স্নানার্থীরা সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। এইভাবে উধাও হইয়া কোথাও যাইতেছি, এই প্রশ্নই অনেক পরিচিতদের মনে বোধ হয় জাগিয়াছিল। কিন্তু কাহারও দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না—যেন কি এক মহাকর্ষণে আমায় নাচাইয়া লইয়া চলিয়াছিল।

"স্ট্রাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে রাণীর ঘাট হইতে। সেই ঘাটে একখানি কলিকাতার পান্সী তরঙ্গহিল্লোলে নৃত্য করিতেছিল। পাল গুটাইয়া রাখা হইয়াছে; তবু বাতাসে তার খানিকটা উড়িতেছে। যেন পতাকার শোভা। নৌকার ছইয়ের উপর একজন যুবক বসিয়াছিল। আমি সংশয়চক্ষে এই নৌকাখানির দিকে চাহিতে চাহিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গেলাম। সেও কোন কথা বলিল না, আমিও কোন কথা বলিতে ভরসা করিলাম না। আবার পিছাইয়া আসিলাম। এই যুবকের দিকে কোন কিছু শ্রবণের প্রত্যাশায় মুখ ফিরাইয়া, আবার কিছুদূর অগ্রসর হইলাম,—দেখিলাম যুবকের দৃষ্টি আমার উপরই নিবদ্ধ রহিয়াছে। এবার ফিরিয়া ভরসা করিয়া বলিলাম, 'আপনারা কি কলিকাতা হইতে আসিতেছেন?' যুবক বলিল, 'হাঁ,—কেন বলুন দেখি?'

"আমি সাহসে ভর করিয়া বলিলাম, 'এই নৌকায় শ্রীঅরবিন্দ আছেন?'

"যুবক আমায় কাছে ডাকিলেন; বলিলেন,—'নৌকায় আসুন।'

"আমি এক লম্ফে নৌকার উপর উঠিয়া পড়িলাম। যুবক আমায় ভিতরে লইয়া যাইতেই দেখিলাম—অন্য এক তরুণের

কোলে মাথা রাখিয়া, চুঁচুড়া প্রাদেশিক সভায় যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম, সেই তপোমূর্তি শ্রীঅরবিন্দই শয়ান রহিয়াছেন। আমায় দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি আমার খবর পাইলেন কোথায় ?'

"আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন, 'এখন কি করিতে পারেন ;—আমায় আশ্রয় দেওয়ার সুবিধা হইবে কি ?'

"গর্বে আমার বুক দুর্-দুর্ করিতেছিল। মনে হইল—সে কি! আপনাকে আশ্রয় দেওয়ার সুবিধা ? প্রাণ চাহিলে যে প্রাণ দিতে বাধে না! আবেগোন্মত্ত হৃদয়—সেদিন বুঝি ছিল ভাল। যাক্ সে কথা। আমি উৎসাহসহকারে বলিলাম,—'আপনাকে তো লইতেই আসিয়াছি।' শ্রীঅরবিন্দ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন,—'কত দূর আপনার বাড়ী ?'

"কিছু দূরে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন—আমি সব ব্যবস্থা করিতেছি।' মাঝিকে নোঙর উঠাইতে বলিলাম। বাতাস বহিতেছিল দক্ষিণ দিক্ হইতেই। আমার গতিও তখন উত্তর দিকে। কিন্তু দাঁড় টানিয়া টানিয়াই—এখন যে স্থানে আমাদের আশ্রমের ঘাট, সেই ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইলাম। ঘাটে স্নানার্থীরা পাছে দেখিতে পায়, এই ভয়ে অঘাটেই তাঁহাকে অবতরণ করাইলাম। তখন ইহাই ছিল শ্মশান।...শ্রীঅরবিন্দ ঐ আশ্রমের কোল দিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া বাড়ীতে উঠিলেন। কেহ লক্ষ্য করিল, কেহ করিল না। আমি বৈঠকখানায় তাঁহাকে আরাম কেদারায় উপবেশন করাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।"

পাঁচ

মতিবাবুর লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, যে দুইজন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা চলিয়া যান। তিনি তখন ইহা মনে করেন নাই যে, তাঁহার উপর শ্রীঅরবিন্দের ভার দিয়া তাঁহারা চলিয়া যাইবেন। মতিবাবু লিখিয়াছেন ঃ

…"আমার মত একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের হাতে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে নির্বিবাদে ছাড়িয়া যাওয়ার ভরসা তাঁহারা সেদিন বোধ হয় ঘটনার দায়েই করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইহাই ছিল অব্যর্থ বিধান। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ এই ঘটনায় সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র মূর্তি পরিগ্রহ করিল। আজ এরূপ না হইলে, আমার অবস্থা কিরূপ হইত—সে কথা নির্ণয় করিয়া বলা খুবই শক্ত। যাহাই হউক, ঘটনা অকল্পিত হইলেও, ভাগবত বিধান এমন অকাট্য হইয়াই বুঝি উপস্থিত হয়।"

শ্রীঅরবিন্দের প্রতি মতিবাবুর গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি যে আগে হইতেই ছিল, তাহা ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে। অজ্ঞাতবাসের প্রথম দিবসেই শ্রীঅরবিন্দ মতিবাবুর জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে মতিবাবু লিখিয়াছেন ঃ

"তিনি আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার আয়ত লোচনের প্রশান্ত দৃষ্টি আমার শরীর-মন স্নিগ্ধ করিয়া দিল। সেদিন সংসারযাত্রার জটিল রহস্যের মধ্যে গতিহীন হইয়া পড়িতেছিলাম; শ্রীঅরবিন্দের আগমনে অকস্মাৎ যেন দক্ষিণ দুয়ার খুলিয়া ঝলকে ঝলকে বসন্তের বাতাস আমার অন্তর বাহির পুলকিত করিয়া তুলিল। প্রকৃতির বুকেও সেদিন প্রত্যক্ষ বসন্তের প্রথম পদসঞ্চার লক্ষিত হইতেছিল। আমার হৃদয়কুঞ্জের শুষ্ক সহকার-শাখা মুকুলিত হইয়া উঠিল; আর হাজার পিকের কণ্ঠ-ঝঙ্কার উঠিয়া আমায় যেন উন্মাদ করিয়া দিল। সহজেই আমি ভাবপ্রবণ

ছিলাম। মাত্রাধিক্যে আমার মাথা যেন টলিয়া পড়িল। বিভোর-দৃষ্টিতে আমিও তাঁহার চক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে স্মৃতি আমার মুছে নাই। এই দৃষ্টি বিনিময়েই আমাদের মধ্যে যে অকৃত্রিম সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইল—আশ্চর্য, ইহা কোন দিন যে মিথ্যা হইতে পারে, এ কল্পনা আমরা কেহই করি নাই। রহস্যময়ী প্রকৃতি মানুষকে এমন করিয়াই কি সম্মোহিত করে? জীবনের অর্ধেক পারাবার পার হইয়া, বর্তমান সত্য-দৃষ্টি অতীতের দিকে চাহিয়া আজও ইহা মোহ-দৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করে না; এমনই বিচিত্র জীবন আমার!"

এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে এই প্রবন্ধে যে সকল উদ্ধৃতি দিয়াছি এবং আরও দিব, তাহা মতিলাল রায়ের রচিত 'জীবন-সঙ্গিনী' (প্রথম খণ্ড) হইতে নিয়াছি। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ তাঁহার সহধর্মিণী রাধারাণী দেবীর স্মৃতি-কথা লিখিত হইয়াছে। হিন্দুর দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রী সহধর্মিণী। হিন্দু-স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনীও বলা হয়। সুতরাং স্বামীর জীবনের সহিত স্ত্রীর অবিচ্ছেদ্য ও অভিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই মতিবাবুর জীবনের অনেক কথাই 'জীবন-সঙ্গিনী' গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতবাস-কালে, মতিবাবুর সুযোগ্যা সহধর্মিণী তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। 'জীবন-সঙ্গিনী' (প্রথম খণ্ড) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে। ১৩৫৭ সালের ২২শে পৌষ (জানুয়ারী ১৯৫১) মতিবাবু ঊনসপ্ততিতম বৎসরে পদার্পণ করিলেন।

'জীবন-সঙ্গিনী' গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে অজ্ঞাতবাস-কালের জীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া মতিবাবু দেশবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। সে কাহিনী বলিবার অধিকারও তাঁহার আছে। কেননা সেই জীবনের সহিত তিনি আশ্রয়দাতারূপে

ঘনিষ্ঠভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কার্যে তাঁহার যে কয়েক জন সতীর্থ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই আজ পরলোকে। এই গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে অজ্ঞাতবাসের পরবর্তী পণ্ডিচেরী আশ্রম-জীবনের প্রথম দিক সম্পর্কেও অনেক জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীঅরবিন্দের জীবিত-কালেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ভাবী-কালের শ্রীঅরবিন্দের চরিত-লেখক কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস-লেখকের পক্ষে গ্রন্থখানি অতিশয় মূল্যবান।

ছয়

শ্রীঅরবিন্দ জানাইলেন—গোপন জীবন যাপন করিবেন, কেহ যেন তাঁর আগমন-সংবাদ জানিতে না পারে। মতিবাবুর পক্ষে যদিও ইহা একেবারেই অভিনব কর্ম, তবু তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সহিত সেই ব্যবস্থা করিলেন।

মতিবাবু তাঁহার বাড়ীর দ্বিতলে এমন একটি অন্ধকার কক্ষ শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতবাসের জন্য বাছিয়া লইলেন, যেখানে মেঝেয় একপুরু ধূলা জমিয়াছিল, এবং কড়ি-কাঠে চামচিকা, আরশুলা, মাকড়সা প্রভৃতি জীব-জন্তুরা এতদিন স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতেছিল। তিনি মেঝেটার কিয়দংশ ঝাঁট দিয়া একখানি শতরঞ্জির উপর ফরাস পাতিয়া দিলেন; শ্রীঅরবিন্দ যন্ত্রপুত্তলিকার মত নীরবে উপবেশন করিলেন। কি ভাবে সংগোপনে তাঁহার স্নানাহার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেই বর্ণনাও মতিবাবুর 'জীবন-সঙ্গিনী' গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। অজ্ঞাতবাসে শ্রীঅরবিন্দের দিন কাটিত—ধ্যান, তপস্যা ও সাধনার মধ্য দিয়া। তাঁহার সাধন-জীবনের যে দিকটা ভক্ত শিষ্যের শুচি-শুভ্র নির্মল দৃষ্টিতে রবিকরোজ্জ্বল দিবালোকের মত পরিষ্কার হইয়া প্রকাশ

পাইয়াছিল, সেই রহস্যাবৃত দিকটাও মতিবাবু অনুপম রচনার সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

অজ্ঞাতবাসের প্রথম দিনের কথা। মতিবাবু সেই অন্ধকার কক্ষে শ্রীঅরবিন্দকে বসাইয়া রাখিয়া জলখাবার আনিতে গেলেন। খাবারের রেকাবী হাতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শ্রীঅরবিন্দকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, তাহা শুনাইতেছি তাঁহারই ভাষায়ঃ

"অতি সন্তর্পণে দালানের অলিন্দ অতিক্রম করিয়া গুদামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। তারপর নিঃশব্দে দ্বিতল কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম—তিনি নীরবে উর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছেন। কি অপার্থিব প্রসন্ন দর্শন! শ্রীঅরবিন্দ ভাবমুখ অবস্থায় আমার গৃহে উপস্থিত হন। তিনি নিজেকে ভগবানের হাতে সর্বতোভাবে ছাড়িয়া দিয়াছেন! কথা কহিলে মনে হইত—যেন আর কেহ কথা কহাইলে তবেই তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হয়! হস্তখানির সঞ্চালনেও বোধ হয় কোন তৃতীয় শক্তি কর্তৃক হস্ত যেন চালিত হইতেছে!"...

মতিবাবুর একান্নবর্তী পরিবার। তার উপর আবার জনসেবক বলিয়া এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন বাড়ীতে বাহিরের লোকের, বন্ধু-বান্ধবের এবং সহকর্মীদের যাতায়াত হইত দিবারাত্রি। লোকজনের দৃষ্টি এড়াইয়া শ্রীঅরবিন্দের মধ্যাহ্ন ভোজনের কোন ব্যবস্থাই মতিবাবু করিতে পারেন নাই। সুতরাং, দোকানের খাদ্যদ্রব্য দ্বারাই শ্রীঅরবিন্দ উদর পূরণ করিলেন।—দোকানের অবিশুদ্ধ ঘৃতপক্ব দ্রব্যাদি তিনি কি নির্বিকার চিত্তে চর্বণ করিলেন! আহারের পর মতিবাবুর সহিত তাঁহার অনেক কথা হইল; ধর্ম সম্বন্ধেই তিনি কথা বলিলেন। ভগবানের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে কিরূপে ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহারই সঙ্কেত দিতে তাঁহার সেদিন যে কি আগ্রহ প্রকাশ পাইয়ছিল, উহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে।

দিনটা কোন রকমে কাটিয়া গেল। কিন্তু রাত্রিতে শ্রীঅরবিন্দকে কোন্ ঘরে রাখা যায়, ইহা নিয়া মতিবাবু বিষম সমস্যায় পড়িলেন। যে অন্ধকার কক্ষটি তাড়াতাড়ি করিয়া বাছিয়া নিয়াছিলেন, সেখানে শ্রীঅরবিন্দকে একা রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অথচ বৈঠকখানায়ও শয়নের ব্যবস্থা করা যায় না, কেননা বাড়ীর লোকেরা জানিতে পারিবে। তখন তাঁহার সে যুগের এক অকৃত্রিম সুহৃদকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। সে সবিস্ময়ে এই কথা শুনিয়া, তাহার বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দকে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে বলিল। আশ্বাস পাইয়া মতিবাবু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

সাত

রাত্রি দশটার পর শ্রীঅরবিন্দকে মতিবাবু তাঁহার সেই বন্ধুর বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিলেন। ইহার পরে কি হইল, তাহা শুনাইতেছি, মতিবাবুর ভাষায়ঃ

"...রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। সর্বদাই মনে হইতে লাগিল—কি জানি, তিনি কি ভাবে রাত্রি যাপন করিতেছেন। সারাদিন উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার পর উক্ত বন্ধুর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম। তিনি আমায় বলিলেন, 'এখান হইতে আমায় লইয়া চল, কাল রাত্রে ঘুমাইতে পারি নাই...'। আমার বন্ধুও রাজী হইল, আমি তাঁহাকে আমার বাড়ী লইয়া আসিলাম।

"সমস্ত ঘর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম,—কোথায় তাঁহাকে গোপনে রাখা যায়। ঠাকুর-দালানের যে ছোট ঘরখানিতে ছেলেরা উপাসনা করিত, তখন উহা বে-মেরামতে পড়িয়াছিল। এ ক্ষুদ্র ঘরখানিও চেয়ারেই বোঝাই ছিল। আমি তাহার একপার্শ্বে শয্যা রচনা করিলাম। রাত্রে সকলে শয়ন করিলে, তাঁহাকে সতর্ক হইয়া আমার অনুসরণ করিতে বলিলাম। তিনি অতি ধীরে আমার

সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র গৃহে উপস্থিত হইলেন। শয্যা গ্রহণ করিয়া তিনি বলিলেন, 'তুমি যাও, এইখানে সুবিধায় থাকিব।' বুঝিলাম—তিনি নির্জনতাই ভালবাসেন; গত রাত্রে গৃহমধ্যে অন্যে থাকায় তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত হইয়াছে। একটি ছোট মশারী টাঙ্গাইয়া, তার চারিদিকে চেয়ারের স্তূপ আরও নিবিড়ভাবে সাজাইয়া নিজ কক্ষে প্রস্থান করিলাম।

"রাত্রিতে কি ঘুম হয়। ভদ্রলোকের যদি কিছু প্রয়োজন হয়, এক ঘটী জলও যে দিয়া আসি নাই। আমি প্রত্যূষে উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম—তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন। যথাসময়ে প্রাতর্ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া কার্যক্ষেত্রে গেলাম।"

এই দিন মতিবাবুর স্ত্রী ওই ঘরটিতে আবর্জনা জমিয়াছে কিনা দেখিতে আসিয়া অকস্মাৎ দর্শন পাইলেন শ্রীঅরবিন্দের। তিনি শ্রীঅরবিন্দের নাম শুনেন নাই। স্বামীর কাছে সেই দিনই প্রথম শুনিলেন শ্রীঅরবিন্দের কথা। স্ত্রীর কাছে ঘটনাচক্রে গোপন বিষয়টি প্রকাশ হইলেও ইহাতে মতিবাবুর পক্ষে তাঁহার উপর ন্যস্ত কাজটি সুসম্পন্ন করার সুবিধাই হইল।

কিছুদিন পরে এই বাড়ী হইতে শ্রীঅরবিন্দকে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অন্য এক বন্ধুর বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। কারণ এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে, লোক-জানাজানি হওয়ার আশঙ্কা, ছিল। তখন মতিবাবুর কাঠের আসবাবপত্র নির্মাণের সঙ্গে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীর কারবারও চলিত। তিনি মধ্য-রাত্রিতে তাঁহার আস্তাবল হইতে নিদ্রিত সহিসের অগোচরে দুইটি ঘোড়া বাহির করিয়া গাড়ীতে জুড়িয়া লইলেন এবং তাহাতে শ্রীঅরবিন্দকে ও একজন বন্ধুকে বসাইয়া নিজেই সহিস সাজিয়া কষ্টেসৃষ্টে গাড়ী চালাইয়া নির্দিষ্ট স্থানে কোন প্রকারে পৌঁছাইলেন। সেখানে যিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার হস্তে শ্রীঅরবিন্দকে সুস্থ শরীরে সমর্পণ করিয়া, গাড়ী হাঁকাইয়া পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

স্থান-পরিবর্তনের পালা এইখানেই শেষ হইল না। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পরেও ইহার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল।

আট

অজ্ঞাতবাসে শ্রীঅরবিন্দ মতিবাবুকে কি শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছেন এবং সাধন-জীবনের কি গূঢ় কথা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মতিবাবু লিখিয়াছেন ঃ

"সারা মধ্যাহ্ন তিনি যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। সেই সময়ে চতুর্ব্যূহ ভাগবততত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইয়াছিল মনে আছে। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধের প্রসঙ্গের কথা তুলিয়া আবেগ-ভরে বলিয়া যাইতেন ; আমি তন্ময় হইয়া শুনিতাম। অবতার সম্বন্ধে তিনি প্রাজ্ঞ ও বিরাট্ প্রকাশের উদাহরণ দিতেন, ব্যাসকে প্রাজ্ঞ ও শ্রীকৃষ্ণকে বিরাট্ পুরুষ বলিয়া আমায় কত কথা বুঝাইতেন। উপনিষদের তত্ত্ব তিনি মুক্তকণ্ঠে বিবৃত করিতেন। সারা মধ্যাহ্ন যে কি আনন্দে অতিবাহিত হইত, তাহা আর বলিবার নয়।

"রাত্রিকালে আমার পূর্বোক্ত বন্ধু আসিয়া রাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিত। আমার উহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট হইত না, চেয়ারে ঠেস দিয়া ঘুমাইতাম। যুক্তিতর্কে মধ্যরাত্রি হইত। তারপর শ্রীঅরবিন্দ নিদ্রা যাইতেন।

"আমার যত প্রবন্ধ ছিল, তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। এই সময়ে 'উদ্বোধন' নাটকখানি লিখিয়া আমরা অভিনয় করিয়া-ছিলাম। সেখানি অগোগোড়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, 'তোমার বাংলা লেখা বেশ। পার তো 'ধর্মে' কিছু কিছু লিখ্‌তে চেষ্টা কর।'

"যে সাহিত্য কল্পক্ষেত্র হইতে মুক্তি খুঁজিতেছিল, তাহা তাঁহারই

নির্দেশে গোমুখীধারার ন্যায় নিঃসৃত হইল। 'ধর্মে' কয়েকটা ক্ষুদ্র সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর 'প্রবর্তকে' সে অজস্র প্রবাহ ছুটিয়া চলে; শিথিল হস্ত, তবু লেখনী স্তব্ধ হয় না। কি জানি, আমার সবখানি যেন তাঁর পরশ-প্রতীক্ষায় এতদিন স্তম্ভিত ছিল, জীবনের সকল দুয়ার একে একে তাঁহার ছোঁয়ায় খুলিতে আরম্ভ করিল। 'উদ্বোধনে' আত্মসমর্পণের কথাই বলিতে চাহিয়াছি; কিন্তু তেমন স্পষ্ট বিশদরূপে বোধ হয় ফুটিয়া উঠে নাই। তিনি সমর্পণের রহস্য বলিলেন। আমারও যেন সব পরিষ্কার হইয়া লক্ষ্যে পড়িল। তাঁহার বন্দী-জীবনে যে সব অপূর্ব রহস্যের অনুভূতি হইয়াছিল, তিনি তাহা একে একে বলিতেন। আমি শুনিয়া বিভোর হইতাম। কেমন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে তিনি শূন্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, কারাগৃহের কঠিন লৌহদণ্ড তাঁহার হস্তস্পর্শে কেমন করিয়া নবনীতুল্য কোমল বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, জেলের উঠানে পিশাচ-মূর্তি দস্যু-তস্কর তাঁহার চক্ষে কেমন ব্রহ্মমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, সর্বভূতে দিব্য বিভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—অনর্গল এই সকল কথা বলিয়া যাইতেন।

"গ্রে স্ট্রীট হইতে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া, একখানা ঠিকা গাড়ী করিয়া তাঁহাকে যখন লালবাজার পুলিস কোর্টে আনা হইতেছিল, তাঁহার সম্মুখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারাক্ষণ বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা ভরসা দিয়াছিলেন—তাঁহার মুখে এ সকল কথাও শুনিয়াছি। আদালত গৃহে বিচারক, উকিল, ব্যারিস্টার, সকলকেই নারায়ণ দর্শন করিয়া তিনি নিজের ভিতর এমন আনন্দ ও উল্লাস অনুভব করিতেন, যে তাঁহার বন্ধন-দশা যে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইতে পারে, তাহা তিনি মনের কোণেও স্থান দিতে পারিতেন না। সে যে কত কথা, আজ তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে হইলে মহাভারত রচনা করিতে হয়।"

নয়

অজ্ঞাতবাস-কালে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মতিবাবুর যে সকল কথাবার্তা ও আলোচনা হইত তাহা অধ্যাত্ম সাধনা সম্পর্কেই। মতিবাবু লিখিয়াছেন :

"শ্রীঅরবিন্দ টাট্‌কা রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার রাষ্ট্রনীতিক যুক্তির কথাও অজস্রধারে বাহির হইতে শুনিয়াছি; কিন্তু সে সব উক্তি আমায় লক্ষ্য করিয়া কোন দিনই বাহির হয় নাই। তিনি আমায় অধ্যাত্ম-সাধনারই সঙ্কেত দিয়াছিলেন। ইহার নিগূঢ় কারণ আর যাহাই থাকুক, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমার জীবনের একটা অভিনব দিক ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

…"তিনি আমায় গীতার এই কথাটা সর্বদা স্মরণ রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, 'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।' আমার মনে যখনই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত, এই মন্ত্র স্মরণ করিতাম; শেষে এমন হইয়াছিল যে, এই মন্ত্রটা মস্তিষ্কবৃত্তির সহিত এরূপ অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল যে, তাহা হইতে মুক্তি পাইতে আমায় বেশ যত্ন স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আর একটা মন্ত্র আমার বুকে তিনি আঁকিয়া দিয়াছিলেন—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্ম ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

শ্রীঅরবিন্দের কৃপায় প্রাপ্ত গীতার মন্ত্রগুলি মতিবাবুর মধ্যে কিরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিল, তৎসম্পর্কে বর্ণনা এইরূপ :

…"অভাব অভিযোগ বীভৎস মূর্তিতে যখন নাকাল করিবার উপক্রম করিত, মনে মনে শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্র স্মরণ করিতাম—

'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।' এই সময়ে একটু আধটু বিপদের কাজেও জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। গোলযোগের সম্ভাবনা বুঝিলে, প্রাণে প্রাণে স্মরণ করিতাম—'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' অন্তরে পাপের উদয় হইলে, তাহা হইতে মুক্তির জন্য ভাবিতাম—"অহং ত্বাম্ সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

"মন্ত্রগুলি আমার নিকট নূতন ছিল না।...

"গীতার মন্ত্রগুলি জানিতাম; কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করার সন্ধান শ্রীঅরবিন্দের নিকট পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। শুনিয়াছি, সেই সময় তিনি এইরূপ অযাচিতভাবে অনেককেই মন্ত্র দান করিতেন। অন্যের কথা জানি না, আমি সেই মন্ত্রে যথার্থই বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পরবর্তী যুগে ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবার আয়োজন হওয়ার খবর পাইয়াও, আমার অন্তরবীণায় ঘন ঘন মন্ত্র-ধ্বনি উঠিত 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' গুরুতর পাপের কথা স্মরণ হইলেও, কে যেন ভিতর হইতে গুঞ্জন তুলিত—'অহং ত্বাম্ সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' মন্ত্রগুলি নিরন্তর স্মরণ রাখার ফলে, বোধ হয় অহোরাত্রের মধ্যে প্রতি দণ্ডেই একটা না একটা মন্ত্র আমার জীবনের দায়ে ব্যবহৃত হইত। আজও অনেক দায় আসে এবং সে দায় হইতে উদ্ধার পাই, কখনও বা নাস্তানাবুদ হই; কিন্তু মন্ত্রের আর প্রয়োজন হয় না। সেদিন ইহা না হইলে যেন সর্বনাশ হইবে, এমনই মনে হইত। তাই আজ ভাবি, ইহা মন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, না মন্ত্রদাতার প্রতি অন্তরের সুনিবিড় অনুরাগ—মন্ত্রদাতাকে মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখারই সঙ্কেত?"

দশ

চন্দননগরে অবস্থান-কালে শ্রীঅরবিন্দের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার যে একটা অভিনব বিচিত্র দিক ভক্ত-শিষ্যের শুদ্ধ মুক্ত দৃষ্টিতে

প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার আলেখ্য শ্রদ্ধার তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন মতিলাল। আলেখ্যখানি এই ঃ

…"তিনি ষোল আনা ভগবানে দেওয়ার কথা বলিয়া গেলেন ; এমন কি হাতখানি নাড়িতে চাড়িতেও কোন এক অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাহা পরিচালিত হয়, ইহা বুঝাইতে নিজের হাত উপরে তুলিয়া যেন আমায় দেখাইয়া দিলেন, 'দেখ, ইহা আমি উঠাই নাই, অন্য শক্তি হাতখানি ধরিয়া উপরে উঠাইয়া দিল।' বিশ্বাস করিলে বিস্ময়ের কথা, নতুবা অনায়াসে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমি বিশ্বাস করিলাম।

"আমার এখনও মনে পড়ে, এই কথার পর তাঁহার গতিবিধি অতিশয় আগ্রহ-সহকারে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। অন্যের চক্ষে ইহা সত্য না হইতে পারে ; কিন্তু আমি দেখিয়াছিলাম—তিনি যখন মাটীর উপর দিয়া চলিতেন, যেন ভূমির উপর তাঁহার পা পড়িত না, কেমন আল্‌গা আল্‌গাভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতেন। পদ-শব্দ হয় কিনা, কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু নিঃশব্দ পদসঞ্চার বলিয়া শ্রুতিও ইহা অকপটে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

"তিনি যখন ভোজন করিতেন, আমার মনে হইত—এই ভোজন ব্যাপারেও তাঁহার কোন চেষ্টা নাই ; তিনি অনন্যমনে আহার করিয়া যাইতেন ; আমি যে অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতেছি, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতেন না। আমার মনে হইত—সত্যই তাঁহার মুখ লইয়া অন্য এক তৃতীয় শক্তি আহার করিতেছে। আমার বেশ মনে পড়িতেছে—আমার কর্ণে ভোজনের শব্দ পর্যন্ত স্পর্শ করে নাই ; এই ভোজন ব্যাপারও নিঃশব্দে সাধিত হইত।

"আর একটা আচরণ স্পষ্ট দিনের মত মনে পড়ে। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি কোন মানুষের চাহনি বলিয়া আমার মনে হয় নাই ; কে যেন তাঁহার চক্ষুর ভিতর দিয়া আমায় স্পর্শ করিতেছে। অবশ্য

এই সবই আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি। তাঁহার চন্দননগরে অবস্থান কালে আরও দুই চারিজনের সহিত তিনি আমার চেয়ে অধিকক্ষণ ছিলেন, এই সকল কথা প্রমাণসিদ্ধ হইবে কিনা জানি না; এমন কি, আমার স্ত্রীকেও শ্রীঅরবিন্দের কথা অতিশয় বিস্ময়ের সহিত, আনন্দের সহিত বলিয়াছি; তিনিও বলিয়াছেন, 'তুমি যখন যাহা করিবে, বলিবে, সবই বাড়াবাড়ি!' আমি রাগিয়া গিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন, 'ইহাতে রাগিবার কথা কি আছে! তুমি যাহা দেখ কর, তাহা তোমার চেয়ে অন্যে ভাল করিয়া দেখিবে বা বুঝিবে, তাহা আশা কর কেন? অন্যের কাছে একটু বাড়াবাড়ি বই কি।'

"এ কলঙ্ক আমার আজও আছে; কিন্তু আমি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—এই জন্য এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

"শ্রীঅরবিন্দ প্রায় ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে থাকিতেন। যখন কথা বলিতেন, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 'আপনি ঐরূপ এক দৃষ্টিতে কি দেখেন?' তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা বুকে আজও তেমন উজ্জ্বলভাবেই আঁকা আছে। তিনি বলিলেন, 'কতকগুলা লিপি ভাসিয়া আসে, অর্থ বাহির করার চেষ্টা করি।' আবার বলিতেন,—'অলক্ষ্য জগতে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদের আকার ফুটিয়া উঠে। অক্ষরের মত এইসব মূর্তিও অর্থময়—কিছু জানাইতে চাহে, সেগুলিও আবিষ্কার করিতে যত্ন করি।"

এগার

এই পলাতক-জীবনে শ্রীঅরবিন্দকে কত কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যেই না দিন কাটাইতে হইয়াছে! যাঁহারা পলাতককে আশ্রয় দান করেন এবং দেখাশুনার ভার নেন, তাঁহাদিগকেও সেই কষ্ট ও অসুবিধার অংশীদার হইতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির রাজনীতিক অভ্যুত্থানের বা রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাসে

দেখা যায় যে, রাজনীতিক নেতা ও কর্মী কিংবা বিপ্লবপন্থী নেতা ও কর্মীকে কার্য-সিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে পলায়নের পথ অনুসরণ করিতে হইয়াছে political strategy বা রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে। যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহাদিগকে শত্রুপক্ষ পলাতক অবস্থায় কোন দিনই বন্দী করিতে পারে নাই। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে খ্যাতিমান নেতাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দই সম্ভবতঃ সকলের আগে এই পথের পথিক হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতিও সাফল্যের সহিত পলায়নের কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মতিবাবু ঠিকই বলিয়াছেন—…"একটা আস্ত মানুষকে সতত গোপন রাখার প্রচেষ্টা যে কি সাংঘাতিক তাহা একাধিক বার অনুভব করিয়াছি ; শ্রীঅরবিন্দকে লইয়াই তাহার সূত্রপাত !"

চন্দননগরে পলাতক জীবনে শ্রীঅরবিন্দকে কিছুদিন তালাবদ্ধ গৃহেও বাস করিতে হইয়াছিল। সেই বিবরণ মতিবাবুর লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

"এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে আমার বাড়ীর অতি নিকটেই রাখা হইয়াছিল। শহরের উত্তর অঞ্চলে সুবিধা না হওয়ায়, কয়েক দিন শহরের মধ্যস্থানের একটা বাগান বাড়ীতে তাঁহাকে রাখবার ব্যবস্থা হয় ; কিন্তু স্থানটি একান্ত প্রকাশ্য বলিয়া মনে হওয়ায়, পুনরায় তিনি শহরের উত্তরাঞ্চলে আসিয়া অবস্থান করিলেন। ব্যবস্থার ভিতর আমিও ছিলাম। সেদিন তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আজ পরলোকে। তাঁহার নিকট হইতে প্রতিদিন সংবাদ পাইতাম। তাঁহাকে গোপন রাখিবার জন্য, এই ভদ্রলোক কলে চাকুরী করেন বলিয়া, বেলা নয়টায় সদর দরজায় চাবী দিয়া বাহির হইতেন, আবার সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিতেন। শ্রীঅরবিন্দের জন্য খাদ্যাদি রাখিয়া দেওয়া হইত, তিনি সারাদিন একা বসিয়া থাকিতেন।

..."এই সময়ে তাঁহার খাদ্যাদি, ফলমূল ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। ভোজনের এই ব্যবস্থা তিনি নিজেই করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল।"

মতিবাবু মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর পূর্বোক্ত স্থানে যাইয়া শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হইতেন। এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে যে সকল কথাবার্তা ও আলোচনা হইত, তাহা অধ্যাত্ম-সাধনা সম্পর্কেই। ইহা হইল শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাইবার এক সপ্তাহ পূর্বের কথা।

বার

শ্রীঅরবিন্দের কলিকাতা হইতে চন্দননগর এবং তথা হইতে পণ্ডিচেরী গমন সম্পর্কে তাঁহার একটি বাণী উদ্ধার করিয়া দিতেছি :

"তোমরা আদেশ বল কাকে ? তা কি রকমে হয় ?

"তখন 'কর্মযোগিন্' মামলা-প্রশ্ন উঠেছিল, পূর্ববৎ রাজনীতিক জীবন, না ভারতের সাধন-রহস্য ? কোনও বুদ্ধি বিবেচনা করলুম না—আদেশ পেয়েছিলুম—Go to Chandernagore. কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই বুঝিনি। তৎক্ষণাৎ শুনেছিলুম—The same thing with Pondicherry coming. এরূপ আকাশবাণী খুব rare জিনিস! কিন্তু আদেশ miracle নয়।"

পূর্বোক্ত বাণী উদ্ধৃত করিয়াছি প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'অরবিন্দ মন্দিরে' পুস্তিকা হইতে। ইহার প্রথম প্রকাশকাল ১৩২৯ সাল। পুস্তিকাখানি ছোট হইলেও হীরার টুক্‌রার সহিত তুলনীয়। গ্রন্থকারের পণ্ডিচেরী বাসকালে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেগুলি ইহাতে গ্রথিত হইয়াছে। তৎকালে গ্রন্থকারের নাম পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় নাই সম্ভবতঃ রাজনীতিক কারণে। প্রবন্ধ-লেখক জানেন 'অরবিন্দ মন্দিরে'

পুস্তিকার লেখক অরুণচন্দ্র দত্ত। ইনি প্রবর্তক সঙ্ঘের একজন আদি সদস্য এবং বিশিষ্ট কর্মী। অরুণবাবু চন্দননগরের একজন সুপরিচিত পৌরজন এবং শাসন-পরিষদের সভ্য। প্রবর্তক সঙ্ঘের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'নবসঙ্ঘ' প্রকাশিত হইতেছে তাঁহারই সম্পাদনায়। প্রবর্তক সঙ্ঘের অধুনালুপ্ত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'The Standard Bearer'-এর সম্পাদকও ছিলেন তিনি। অরুণবাবু যে শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ স্নেহের পাত্র ও কৃপাভাজন ছিলেন, তাহা লেখক নিজে পূর্ব হইতেই জানেন। কিছু দিন আগে (২৪শে অগ্রহায়ণ) চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রী৺রাধারাণী দেবীর একবিংশতিতম তিরোভাবোৎসবে লেখক পৌরোহিত্য করিতে যাইয়া সঙ্ঘগুরু মতিলালের সহিত শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে কথোপকথন কালে আবার সে কথাটি শুনিয়াছেন। সুতরাং 'অরবিন্দ মন্দিরে' নির্ভরযোগ্য পুস্তিকা বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গৃহীত হইতে পারে।

তের

এইক্ষণ শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে অবস্থানের শেষ দিবসের কথা বলিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি। সে দিনটি ছিল ১৯১০ সালের ৩১শে মার্চ। গভীর রাত্রিতে শ্রীঅরবিন্দ গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকায় উঠিয়া চন্দননগর হইতে বিদায় লইলেন। বিদায়-বেলার বর্ণনা মতিবাবুর 'জীবন-সঙ্গিনী' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"এইভাবে এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, তাঁহার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করি নাই। হঠাৎ তাঁহার যাওয়ার ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তাঁহার পণ্ডিচেরী যাওয়ার কথাই স্থির হইয়াছিল ; কেমন করিয়া যাইবেন, সে আয়োজনের মধ্যেও আমার প্রয়োজন ছিল। লোকজনের ব্যবস্থা করিয়াও, কেন যে আমি বিদায়-কালেও তাঁহার

৫

নিকট গেলাম না, তাহা জানি না। দেহটা একদিকে, চেতনা অন্য দিকে, জীবনের সামঞ্জস্য রাখা শক্ত হইয়াছিল। কখনও কাজে খুব ঝোঁক দিই, কখনও বা স্থির হইয়া বসিয়া থাকি। যে-রাত্রি তিনি চন্দননগর ছাড়িয়া যাইবেন, সেই রাত্রিতে যাহা যাহা প্রয়োজন সব সারিয়া, যথাসময়ে আহারাদির পর শয্যা গ্রহণ করিলাম।

"অর্ধ রাত্রির পর ডাক শুনিলাম। আমার স্ত্রী ডাক শুনিলেই সাড়া দিতে নিষেধ করিতেন, জাগিয়া থাকিলে মুখ চাপিয়া ধরিতেন। কিন্তু রাত্রে ডাকাডাকির ব্যাপার আমার অনেক দিক দিয়াই ঘটিত; কাজেই তাঁহার এই আকুলতার মূল্য রাখা সম্ভব হইত না। আমি উঠিয়া বসিতেই তিনি বলিলেন, 'কোথায় যাবে?'

'অরবিন্দবাবু আজ যাচ্ছেন, বোধ হয় দেখা ক'রতে হবে।'

'তিনি বলিলেন, 'তুমি তো আচ্ছা লোক—এত করা হ'ল, যাবার সময়ে সাম্‌নে গিয়ে তো একবার দাঁড়াতে হয়। তুমি বাবু এত কর, কিন্তু শেষ রাখ্‌তে পার না—এই জন্য তোমার শত্রু-বৃদ্ধি হয়!

'আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হওয়া মাত্র, আমার পরিচিত বন্ধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ব্যাপার?'

'তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'তিনি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে চান।'

"আমি কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া চলিলাম। তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সন্ধিক্ষণ মাত্র। চারিদিক নিস্তব্ধ—কেবল রাত্রিচর প্রাণীর অস্পষ্ট শব্দ শুনা যাইতেছিল। আকাশে আধখানা চাঁদ ভাসিতেছে। ধরণী জ্যোৎস্না-প্লাবিত। তখনও দারুণ গ্রীষ্মের আরম্ভ হয় নাই; বসন্ত-পবন দেহ শীতল করিয়া দিল। শ্যাম তৃণদলে শিশির পড়িয়াছে; চন্দ্রকিরণে যেন তাহা নক্ষত্রখচিত বলিয়া মনে হইতেছিল। সম্মুখে প্রবাহিণী ভাগীরথী চূর্ণ-হীরক-খনির মত চক্ষু ঝল্‌সিয়া দিল। দেখিলাম—শ্রীঅরবিন্দ নদীতটে দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

"আকুল হইয়া চরণে প্রণতিজ্ঞাপক করিলাম। সেদিন, আর চিরবিদায়ের দিন, একইভাবে তিনি বুকে ধরিয়াছিলেন। একদিন প্রতিষ্ঠার মিলন, অন্যদিন বিসর্জনের চিরবিরহ; স্পর্শের আস্বাদে কিন্তু আমার পার্থক্য বোধ হয় নাই!

"আমি চলিলাম—আবার দেখা হবে।"

"আমি অবাক্ হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম: 'সে আশা আর রাখিলেন কৈ? মনে রাখিবেন।'

"তাঁহার চক্ষু যেন ছল্ ছল্ করিতেছিল; মাথার উপর কর অর্পণ করিয়া তিনি বলিলেন: 'তোমার হবে। সাধনা ঠিক রেখো—কোন ভাবনা নেই। কিছু হয়েছে, আরও হবে।'

"আমি আর কি বলিব—নির্বাক্ রহিলাম!

"তীরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি আমার অন্যান্য বন্ধুদের সহিত তরণীতে আরোহণ করিলেন। ক্ষেপণীর শব্দ হইল—ছপাৎ, দূরে দূরে তরণী ভাসিয়া যায়। অনিমেষ চাহনি লইয়া চারি চক্ষু সেদিন কেন যে এমন করিয়া এক হইয়াছিল! দৃষ্টি যখন উভয় পক্ষেই কষ্টকর, মাঝে কুয়াশাচ্ছন্ন আলোকচ্ছায়ার যবনিকা ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইলাম। সেদিন বুঝিলাম—দেখাশুনা করি আর নাই করি, বুকটা যেন কে পূর্ণ রাখিয়াছিল, আজ শূন্য হইয়া গেল! সজল নয়নে শয্যায় আছাড় খাইয়া পড়িলাম; স্নেহবিগলিত পবিত্র করসঞ্চালনে বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া নূতন সূর্য সন্দর্শন করিলাম।"

দেবতা-বিদায়

[বর্তমান নিবন্ধের লেখক বাংলার স্বদেশী-আন্দোলনের স্বনাম-খ্যাত একজন কর্মী ও নেতা। উনিশ শ' পাঁচে, বাংলা দেশে যে প্রাণের জোয়ার এসেছিল, তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে সেই প্রাণ-বন্যাকে করেছিলেন গ্রহণ। একান্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের অতি-নিকটবর্তী সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের কাহিনী এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ভুলে যেতে বসেছি। আজকের যুগে যাঁরা তরুণ, তাঁদের কাছে সেই-যুগকে চিনিয়ে দেওয়া আমাদের সর্বপ্রথম সাহিত্যিক দায়িত্ব। কিন্তু সেই যুগের পরিচায়ক কোন ইতিহাসই আজ পর্যন্ত আমরা রচনা করতে পারলাম না। তাই আমরা চেষ্টা করছি, আজও যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের জীবনে সেদিনকে চিনেছিলেন, জেনেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে সেদিনের স্মৃতিকে উদ্ধার করতে। নগেনবাবু বর্তমান রচনায় সেদিনকার একটি প্রধান-ঘটনাকে নিজের স্মৃতি এবং অন্যান্য সহযাত্রীদের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন। সেই ঘটনাটি হলো, শ্রীঅরবিন্দের বাংলা থেকে পণ্ডিচারীতে অন্তর্ধান। অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাষায় সেই ঘটনার নামকরণ তিনি করেছেন, দেবতা-বিদায়। এই সব স্মৃতিকথা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অতি মূল্যবান সম্পদ। কারণ, এই সব রচনাই একদিন হবে ঐতিহাসিকের সব চেয়ে বড় সহায়। ইতিহাসের কথা বাদ দিয়েও, এই জাতীয় রচনার সাহিত্য হিসেবে আজ একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। এই সব রচনার ভিতর দিয়ে আমরা আর একবার উপভোগ করতে পারি, সেই মহাজীবনকে, যাঁর দেহ চলে গিয়েছে আমাদের চোখের সামনে থেকে অথচ যাঁর মন আমাদের মনের সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে

আমাদের সকল কাজের পেছনে, সকল কর্ম-প্রেরণার অদৃশ্য উৎসরূপে। এই রচনা তাই হয়ত স্মরণ করিয়ে দেবে আমাদের প্রাণ-উৎস কোথায় রয়েছে!]—সম্পাদক*

এক

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা। বাংলার পূর্ব প্রান্তে ছোট্ট একটি শহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (এখনকার নবম শ্রেণী) পড়িতেছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। বাংলার অন্যান্য জিলার ছাত্র ও যুবকদের মত আমরাও সেই বাজনা শুনিয়া মাতিয়া উঠিলাম।

ভারতের তদানীন্তন বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই আগস্ট কলিকাতায় টাউন হলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইল। লোকসমাগম এত অধিক হইয়াছিল যে, টাউন হলের নিকটস্থ ময়দানে একই সময়ে আর-একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হইল। স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা দ্রুতগতিতে সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া দিল।

বাংলার এই নবজাগৃতি বা 'রিন্যাসাঁস'-এর যুগে প্রথম দিকে আমরা যে সকল জননায়কের কথা শুনিতাম, তাঁহাদের মধ্যে সকলের শীর্ষস্থানে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালে তিনি এতটা লোকপ্রিয় ছিলেন যে, দেশবাসী তাঁহাকে বাংলার অনভিষিক্ত রাজা ('Uncrowned King of Bengal') বলিয়া

*এই প্রবন্ধটি 'গল্পভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে 'গল্পভারতী'র সম্পাদক ছিলেন বঙ্গবিশ্রুত সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

অভিহিত করিত। সুরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর যে সকল নেতার নাম শুনিতাম, তন্মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের নাম তখন পর্যন্তও মফঃস্বলের ছাত্র আমরা শুনিতে পাই নাই।

অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই স্বদেশী-আন্দোলন বিপুল আকার ধারণ করিল। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শত শত কণ্ঠের জাতীয় সঙ্গীতে বঙ্গদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল। একটা পরাধীন জাতির এই নবজাগরণ অসহনীয় হইল বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর নিকট। দমন-নীতির নিষ্পেষণ-যন্ত্র চালিত হইল ছাত্র ও যুবকগণের বিরুদ্ধে। অভিযানের পুরোভাগে ছিলাম বলিয়া অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না।

বয়স আমার তখন বছর ষোল হইলেও স্থানীয় ছাত্রসমাজে একজন মোড়ল বলিয়াই পরিগণিত ছিলাম। সেই বৎসরের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে রাজনীতিক আন্দোলনে মোড়লির জন্য ছাত্রের প্রাপ্য চরম পুরস্কার মিলিল আমার ভাগ্যে। চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টার জনাব মৌলবী আবদুল করিমের আদেশে নোয়াখালী জিলা-স্কুল হইতে চিরদিনের জন্য বহিষ্কৃত (Rusticated) হইলাম। কি অপরাধে ও কি অবস্থায় এই বহিষ্কারের আদেশ প্রদত্ত হইল, তাহার বিবরণ চমকপ্রদ এবং উপভোগ্য হইলেও এই স্থলে তাহা বিবৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর স্ফীত করিতে চাহি না। যে নয়জন ছাত্রের উপর বহিষ্কারের আদেশ হইল, তন্মধ্যে পাঁচজন ক্ষমা চাহিয়া অব্যাহতি পাইল। কিন্তু আমাদের স্থানীয় প্রধান নেতা রজনীকান্ত বসুর সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও আমরা চারিজন দেবেন্দ্র চৌধুরী, হরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ৺আস্রাফ আলী এবং আমি ক্ষমা চাহিয়া বিদ্যালয়ে পুনঃ প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলাম।

সবচেয়ে বেশী মুশকিলে পড়িতে হইল আমাকেই। বহিষ্কারের দুঃসংবাদে আমার পরিবারে বিষাদের ছায়া পড়িল। আমার মা

ও মাতুলের সম্পত্তি ছিল কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এর পরিচালনাধীন। সুতরাং আমিও ছিলাম 'কোর্টের অনুপালিত ওয়ার্ড'। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং আমার অভিভাবক। লেখাপড়ায় একেবারে মন্দ ছিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে তেমন কঠিন হইত না। তারপর 'কোর্টের অনুপালিত ওয়ার্ড' বলিয়া উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইবার সুযোগ-সুবিধাও ছিল। বিশেষতঃ সে-সময় লর্ড কার্জন দেশের লোকের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া প্রভিন্সিয়াল্ সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্তে মনোনয়ন-প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

দুই

বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর পরিবারের লোকেরা আমার অনমনীয় মনোভাবের পরিবর্তনের জন্য নানাভাবে চাপ দিতে লাগিলেন। তখন দৈহিক সাজার বয়স পার হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সেই দিক দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু তিরস্কার, গঞ্জনা, কটু ভাষণ এবং কর্কশ ব্যবহারের মাত্রা এমনি চরমে উঠিল যে, স্নান-আহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত বাকী সময়টা আমাকে কাটাইতে হইত বাড়ীর বাহিরে। মনে-মনে স্থির করিলাম বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইব। স্থলপথে রেলগাড়ীতে যাইব, না জলপথে জাহাজে যাইব, তাহাও স্থির করিয়া ফেলিলাম। সমস্যা দেখা দিল পথ-খরচের টাকা লইয়া। সে সমস্যার সমাধান সহজ ছিল,— যদি বাড়ীতে ক্যাস্-বাক্স ভাঙ্গিবার ইচ্ছা থাকিত। নিজের অর্থ হইলেও ওই ভাবে আত্মসাৎ করার প্রতি আমার বাল্যকাল হইতেই একটা স্বাভাবিক ঘৃণা রহিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, ইহারই কয়েক বৎসর পরে বিদেশী বিতাড়ন ও স্বাধীনতা-

প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় উন্মাদনার মুখে ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের পন্থার শুধু সমর্থন নহে—অনুসরণ পর্যন্ত করিয়াছি স্বচ্ছন্দমনে।

চারিজন সহকর্মী ছাত্র-বন্ধুকে (তারক মজুমদার, ৺বরদা সেন, ৺প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রভূষণ মজুমদার) এই পরিকল্পনার কথা জানাইলে তাঁহারা অনুমোদন করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন অবস্থাপন্ন ছিলেন এবং অভিভাবকের অগোচরে কিছু টাকা খরচ করার মত সুযোগও তাঁহাদের ছিল। এই দুইজনই আমাকে টাকা দিলেন। টাকার পরিমাণ সঠিক মনে না থাকিলেও ইহা স্মরণ আছে যে, ত্রিশ টাকার কম নহে এবং চল্লিশ টাকারও বেশী নহে। যাত্রার দিন স্থির হইল। একটা নূতন ক্যান্‌ভাসের ব্যাগে জামা-কাপড় ভরিয়া এবং শুইবার জন্য একখানা মোটা বিছানার চাদর লইয়া বাড়ীর লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম।

সেদিন ছিল পৌষ মাসের শীতের রাত্রি, কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন। সুরু হইল—আমার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আমার অনিশ্চিতের পথে যাত্রা, নবীন সাধকের জীবনে প্রথম তীর্থ-যাত্রা। এই দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াই উত্তর কালে দেবতার দর্শন পাইয়াছি, দেবতার সঙ্গ-লাভ করিয়াছি, দেবতার বাণী শুনিয়াছি, আর লোক-লোচনের অন্তরালে একদিন অতি সংগোপনে দেবতাকে বিদায়ও দিয়াছি। আজ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় লাভ-লোকসানের খতিয়ানে, সফলতা-বিফলতার হিসাব-নিকাশে এবং ভাল-মন্দের বিচারে দেখিতে পাইতেছি,—সেদিন ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া-চিন্তিয়া, ব্যক্তিগত শুভাশুভ বিচার-বিবেচনা না করিয়া, উন্মাদনার মুখে যে-পথে নামিয়াছিলাম, সে-পথ বিপথ নহে, সে-পথ আমার চিরন্তন পথ, সে-পথ আমার সার্থক পথ।

আমাদের শহরের বাড়ী হইতে স্টীমার স্টেশন ছিল প্রায় ৫।৬ মাইল দূরে। পূর্বোক্ত চারি জন সহকর্মীর মধ্যে অর্থসাহায্যকারী

ব্যতীত অপর দুই জন (প্রভাস ও চন্দ্রভূষণ) আমাকে বরিশাল-গামী জাহাজে উঠাইয়া দিলেন। বরিশাল হইয়া খুল্না লাইনে কলিকাতায় যাইব স্থির করিয়াছি। রেলপথে চাঁদপুর হইয়া যাই নাই এই জন্য যে, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এর কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রাম করিয়া পুলিসের সাহায্যে পথে আমাকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু জলপথে সে-আশঙ্কা ছিল না। যথাসময়ে বরিশাল পৌঁছিলাম এবং তথায় একদিন বিলম্ব করিয়া জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। আমার সাহায্যকারী বন্ধু প্রভাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেসে' উঠিয়াছিলাম। তিনি অশ্বিনীকুমারের প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। সুগায়ক বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। পরবর্তী কালে তিনি নোয়াখালীতে ওকালতি করেন। বরিশাল ও নোয়াখালীতে একজন আদর্শ দেশসেবক বলিয়া তাঁহার মানমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল যথেষ্ট।

তিন

কলিকাতায় পৌঁছিয়া আমি ১০৭নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের মেসে উঠিলাম। সেখানে নোয়াখালীর কয়েকজন কলেজের ছাত্র থাকিতেন। নোয়াখালীতে স্বদেশী আন্দোলনের কার্য পরিচালনা উপলক্ষে তাঁহাদের সহিত আমাদের পত্র-বিনিময় হইত। দুই-দিন পরে তাঁহাদের উপদেশ মতে আমি সাক্ষাৎ করিলাম ৬নং কলেজ স্কোয়ারে (বর্তমানে বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট) 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্যের সহিত আমার বহিষ্কার ও পলায়ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। ধীর-স্থির গম্ভীর মানুষ; একটি মন্তব্যও তিনি করিলেন না, বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে মাঝে-মাঝে মৃদু হাসিলেন। আমার কথা শেষ করিয়া বলিলাম,—"আমি ত কোনো অন্যায় করিনি, ক্ষমা চেয়ে

কিছুতেই আমি স্কুলে ঢুক্‌ব না।" মিত্র মহাশয় কহিলেন, "তুমি আমার বাড়ীতেই থাক্‌বে, পড়াশুনার ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি।"

সেই দিন হইতেই আমি মিত্র মহাশয়ের পবিবারভুক্ত হইয়া গেলাম। 'সঞ্জীবনী' কার্যালয়ের নিকটেই······নং কলেজ স্কোয়ারে প্রসিদ্ধ ছাত্র-প্রতিষ্ঠান য়্যান্‌টি সার্কুলার সোসাইটির কার্যালয় ও কর্মীদের থাকিবার 'ব্যারাক'। আমিও সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মী-তালিকাভুক্ত হইলাম। যে সকল নেতার নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইত, তন্মধ্যে মিত্র মহাশয় ছিলেন অন্যতম। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীসুকুমার মিত্র ছিলেন ইহার একজন প্রধান কর্মী। থাকিতাম সোসাইটির 'ব্যারাকে', আর খাওয়া-দাওয়া হইত তাঁহাদের বাড়ীতে। এই বাড়ীতেই মিত্র মহাশয়ের ছেলে-মেয়েদের মুখে আমি সর্বপ্রথম শুনি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের নাম। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদের 'আরো দা'। শুনিলাম,—'আরো দা' সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা পাস করিয়াও ঘোড়ায় চড়িতে জানেন না বলিয়া জজ কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারেন নাই। ইহাও শুনিলাম,—তিনি গ্রীক-ল্যাটিন ভাষার পরীক্ষায় ইংরেজ ছাত্রদের পিছনে ফেলিয়া একেবারে উপরে স্থান পাইয়াছেন; অনেক ইংরেজ অধ্যাপকও তাঁহার মত ইংরেজী লিখিতে পারেন না, ইংরেজী ভাষার তিনি একজন বড় কবি। আরো শুনিলাম,—ভারতের বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির তিনি একজন নেতা।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ববৎসর বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতি এবং নিহিলিস্টদিগের কথা শুনিয়াছি সত্য, কিন্তু তৎসম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না এবং জ্ঞানও ছিল ভাসা-ভাসা। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর গুপ্ত-সমিতি ও নিহিলিস্ট সম্বন্ধে বড়দের মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমার ধারণা সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং মোটামুটি জ্ঞান লাভও করিয়াছি। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়াতেই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পড়িয়াছিলাম। গুপ্ত-সমিতি ও নিহিলিস্টদিগের দুঃসাহসিকতার

কাহিনী আমার মনকে বিশেষভাবেই আকর্ষণ করিল। তখন ত আর জানিতাম না যে, ভাবীকালে একদিন আমি ভারতের একটি বিখ্যাত বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য হইব, বাংলার পূর্বাঞ্চলের একটি জিলায় সেই প্রতিষ্ঠানের শাখা সমিতি পরিচালনার নেতৃত্ব আমারই উপর ন্যস্ত হইবে, এবং সেই সংস্রবে আমাকে বিদেশী রাজার অতিথি হইয়া দীর্ঘকাল বন্দী-জীবন যাপন করিতে হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ-জননী—স্বর্ণলতা, এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সহধর্মিণী—লীলাবতী সহোদরা ভগিনী। ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতা, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যসেবক, চিন্তানায়ক ও ভারতীয় জাতীয়তার অন্যতম আদ্যাচার্য রাজনারায়ণ বসু উঁহাদের পিতা। মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে 'আরো দা'র কথা শুনিয়া আমার মনের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় করিয়া একটি রহস্য-লোকের সৃষ্টি হইল। সেই রহস্যলোকে তখন শ্রীঅরবিন্দ অধিষ্ঠান করিতেছেন অতীন্দ্রিয় পুরুষের মত।

ইহার কিছুকাল পরে (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (Bengal National Council of Education) প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য কলিকাতার সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দেশবাসী বিরাট জনসভায় তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করিয়া অভিনন্দিত করিল এবং অন্তরের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইল। তদবধি এই দানবীর দেশভক্ত 'রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক' বলিয়া অভিহিত হইতেন। পরিষদ কর্তৃক কলিকাতায় 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ য়্যাণ্ড্ স্কুল' নামে একটি জাতীয় শিক্ষায়তন স্থাপিত হইল।

এই শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ পদ শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করিলেন মাত্র দেড় শত টাকা বেতনে। বরোদা সরকারী কলেজের সহ-অধ্যক্ষের

পদে তিনি পাইতেন সাড়ে সাত শত টাকা। বরোদার তৎকালীন মহারাজার নিকট তাঁহার প্রতিভা ও মনীষার সমাদর ছিল যথেষ্ট। পদত্যাগ করিয়া না আসিলে ভাবীকালে একদিন তিনি যে বরোদা রাজ্যের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহা সুনিশ্চিত। স্বদেশের কল্যাণার্থ এইরূপ স্বার্থত্যাগ তখন বিরল ছিল। শ্রীঅরবিন্দের অনুসৃত ত্যাগের আদর্শ দেশবাসীর মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। সংবাদপত্রে, সভাসমিতিতে, বক্তাদের ভাষণে এবং লোকমুখে তাঁহার প্রশংসা প্রচারিত হইতে লাগিল।

চার

কলিকাতায় আসিবার পর শ্রীঅরবিন্দ কিছুকাল ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিকের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে রাজা সুবোধচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া আমি সর্বপ্রথম শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাইলাম। রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পশ্চাতে যে ছোট এক টুক্‌রা ইতিহাস রহিয়াছে, তাহা এই স্থলে বলিয়া লইতেছি। পলাইয়া আসিবার সময় বরিশালে যখন অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে দেখা করি, তখন তাঁহাকে আমার ও অন্যান্য ছেলেদের বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কারের বৃত্তান্ত, আমার পলায়ন কাহিনী এবং নোয়াখালীর তৎকালীন রাজনীতিক পরিস্থিতি সবিস্তারে বলি। কলিকাতায় পৌঁছিয়া আমি যেন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের সহিত সাক্ষাৎ করি, তিনি আমাকে সে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ঘটনা-চক্রে আমাকে প্রথম সাক্ষাৎ করিতে হইল কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে। তাঁহার বাড়ীতে আমার আশ্রয় মিলিয়া যাওয়ায় আমি তখন আর রাজার সহিত দেখা করার আবশ্যকতা বোধ করি নাই।

একদিন রাজা আমাকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলে আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিলাম, কেন তিনি ডাকিয়াছেন! মনে মনে খুশী হইলাম। আমার কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরে একই সঙ্গে বহিষ্কৃত আমার দুইজন সহকর্মী ছাত্রবন্ধুও কলিকাতায় আসিলেন এবং তাঁহারা আশ্রয় পাইলেন রাজা সুবোধচন্দ্রের বাড়ীতে। তাঁহাদের দিয়াই তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় কিছুই তাঁহারা বলিতে পারিলেন না। কেবল এইটুকু জানা গেল যে, রাজা আমার সম্পর্কে তাঁহাদের নিকট হইতে বিস্তারিত খোঁজ-খবর লইয়াছেন। পরে রাজার কাছেই শুনিয়াছি যে, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত ইতিমধ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং রাজার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকালে আমার সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমার সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমারের যে ভাল ধারণা হইয়াছিল, ইহার পরিচয় বরিশালেই পাইয়াছি। বুঝিলাম, তিনি আমার কথা ভুলেন নাই এবং রাজার মনে আমার সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন।

রাজার বসিবার ঘর ছিল নীচের তলার হল্‌-ঘরের সংলগ্ন পশ্চিম দিকের কোঠা। আমার পূর্বোক্ত সহকর্মীদের একজন আমাকে রাজার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলে আমি রাজাকে প্রণাম করিলাম। গদি-দেওয়া বড় একখানা কেদারায় তিনি বসিয়াছিলেন। দীর্ঘাকৃতি, গৌরকান্তি, হৃষ্টপুষ্ট ও সুদর্শন পুরুষ। রাজোপাধিতে ভূষিত হইবার মতনই অবয়ব। মহাকবি কালিদাসের ভাষার কিছুটা পরিবর্তন করিয়া বলা যাইতে পারে আকারসদৃশ প্রশস্ত-হৃদয়। সামনের একখানা কেদারা দেখাইয়া দিয়া তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি বসিতেই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অরবিন্দ ঘোষের নাম শুনেছ?" আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জবাব দিলাম,—"হাঁ, শুনেছি।" রাজা

তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোককে দেখাইয়া দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই আসন হইতে উঠিয়া গিয়া শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম করিলাম। তিনি ছিলেন পাঠরত। হাতের পুস্তক হইতে নিবদ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া আমার দিকে একবার চাহিলেন মাত্র। রহস্যলোকে অধিষ্ঠিত অতীন্দ্রিয় পুরুষ অকস্মাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠিলে এবং সাধারণ মানবের রূপ ধরিয়া একেবারে চোখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলে মানুষের যেমন আনন্দের অন্ত থাকে না এবং বিস্ময়েরও সীমা থাকে না, আমার অবস্থাও তখন তদ্রূপ।

শ্রীঅরবিন্দের বেশ-ভূষায় কোনো পরিপাট্য নাই। তাঁহার কাপড় জামা জুতা সাদাসিধা রকমের। পরনে সাধারণ দেশী ধুতি, গায়ে টুইলের টেনিস্কাপ সার্ট, পায়ে চটি। সৌম্য-শান্ত গম্ভীর মূর্তি, চক্ষু দুইটি তেজোময়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। অরবিন্দ-দর্শনের সেই প্রথম দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ভাগ্য প্রসন্ন! তাই সেদিন রাজ-দর্শনের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার দেবতার দর্শনও মিলিল।

পাঁচ

ইহার পর হইতে আমি মাঝে মাঝে রাজা সুবোধচন্দ্রের বাড়ীতে যাইতাম। প্রায় দিনই সেখানে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাইয়াছি। অতঃপর নোয়াখালীতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতার জাতীয় বিদ্যালয় ছাড়িয়া তথায় যাইয়া পঞ্চম মান শ্রেণীতে (প্রবেশিকা) ভর্তি হই। পরে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় ন্যাশান্যাল কলেজের অধ্যাপক-পদে ইস্তফা দেন। জাতীয়তাবাদী দলের মুখপত্র নব প্রকাশিত ইংরাজী "বন্দে মাতরম্"-এর সম্পাদনা ভার তিনি গ্রহণ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় "বন্দে

মাতরম্” পত্রিকা অল্পকাল মধ্যে সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই পত্রিকা স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছিল প্রধানতঃ রাজা সুবোধচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে। তিনি যুগান্তর বিপ্লবী দলের কার্যের জন্যও প্রচুর অর্থদান করিয়াছিলেন।

“বন্দে মাতরম্”-এর একটি প্রবন্ধের জন্য শ্রীঅরবিন্দ পত্রিকার সম্পাদক স্বরূপ এবং অপূর্বকৃষ্ণ বসু মুদ্রাকর ও প্রকাশক স্বরূপ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পাইলেন; কিন্তু মুদ্রাকর ও প্রকাশক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই উপলক্ষ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত বিখ্যাত ‘নমস্কার’ কবিতার মধ্য দিয়া ‘অরবিন্দ, রবীন্দের লহ নমস্কার’ বলিয়া দেশনায়ককে নমস্কার নিবেদন করিলেন। সেই অনবদ্য কবিতায় সেদিন রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন দেবতার রুদ্র দূতরূপে শ্রীঅরবিন্দের জয়গান,—

............“জয়, তব জয়।
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল?
মোছরে দুর্বল চক্ষু, মোছ অশ্রুজল।
দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি’ করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।”......

ইহার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ) বিহারের মজঃফরপুর শহরে সংঘটিত হয় বোমা নিক্ষেপের ঘটনা। অত্যাচারী ইংরাজ বিচারক মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে নিধন

করিবার জন্য যুগান্তর বিপ্লবী দল কর্তৃক প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে ইউরোপীয়ান্ ক্লাবের প্রবেশ-দ্বারে একখানি চলন্ত ফিটন গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু সেই গাড়ীতে মিঃ কিংস্‌ফোর্ড ছিলেন না। গাড়ী নির্বাচনের ভুলের দরুন বিস্ফোরিত বোমায় নিহত হইলেন স্থানীয় উকিল কেনেডি সাহেবের পত্নী ও কন্যা। ঘটনাস্থল হইতে ২৪ মাইল দূরে পরদিবস ১লা মে ক্ষুদিরাম ধৃত হইলেন। মোকামাঘাট স্টেশনে প্রফুল্লকে পুলিসের লোকেরা ২রা মে ধরিবার চেষ্টা করিলে বীর যুবক পর পর দুইবার রিভল্‌ভারের গুলি ছুড়িয়া আত্মহনন করেন; আর বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ।

পূর্বোক্ত ঘটনার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ কিরূপ ও কতটা ছিল ইহা তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ও শিষ্য বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন ঃ

'জজ কিংস্‌ফোর্ডের হাতে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ থেকে অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্মীর বিচার ও শাস্তি হয়। বালক সুশীল সেনকে বেত মারার হুকুম দিয়েছিলেন এই শ্বেতাঙ্গ বিচারক কিংস্‌ফোর্ড। তাই আমাদের গুপ্তচক্রের তিনজন নেতা শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক ও চারু দত্ত মহাশয়ের আদেশে এই জজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দুই বিপ্লবী বালক সেই আজ্ঞা পালন করে দেশহিতব্রতের কণ্টক উৎপাটন করতে মজঃফরপুরে এসেছিল। নরহত্যা ও জীব-হত্যা মহাপাপ, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সেই পাপই মহাপুণ্য আখ্যা লাভ করে।'—(১৩৫৪ শারদীয় সংখ্যা যুগান্তরে প্রকাশিত 'অগ্নি-শিশু ক্ষুদিরাম')।

মজঃফরপুরের ঘটনার পর ২রা মে কলিকাতার নানা স্থানে

খানাতল্লাশী হয়। ফলে মানিকতলা অঞ্চলে ৩২নং মুরারীপুকুর রোডে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের বাগান-বাড়ীতে যুগান্তর বিপ্লবী দলের বোমা নির্মাণের কারখানা ও অস্ত্রাগার আবিষ্কৃত হইল। এইখানে গ্রেপ্তার হইলেন বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েক জন। শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলেন ৪৮নং গ্রে স্ট্রীটের বাড়ীতে। এই আবিষ্কার হইতে যে রাজনীতিক মামলার সৃষ্টি হয়, তাহা আলিপুর বোমার মামলা নামে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। চব্বিশ পরগনা জেলার আলিপুর দায়রা আদালতে এই মামলার বিচার হয়। ইহা মানিকতলা বোমার মামলা বলিয়াও পরিচিত। ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন ও নরহত্যার মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ এবং রাজদ্রোহ, বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র রাখা ইত্যাদি অপরাধের অভিযোগ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত হইল। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন প্রধান আসামী এবং সরকার পক্ষ হইতে তাঁহাকে এই বিপ্লবী দলের অধিনায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

ছয়

নোয়াখালী জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় লাঠি, অসি ও ছোরা খেলা শিক্ষার আখড়ায় নিয়মিত ভাবে আমি যোগদান করিতাম। তখন বিপ্লবী দলের মুখপত্র বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' দেশময় বিপ্লবের অগ্নি-কণা ছড়াইতেছিল। যুগান্তরের স্তম্ভগুলি ছিল আগ্নেয়গিরির মত। প্রতি সপ্তাহে এই গিরি-দেহ হইতে উদ্গীর্ণ হইত স্বৈরতান্ত্রিক বিদেশী রাজের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। যুগান্তর-পাঠ ছিল আমার গীতা পাঠের ন্যায় অবশ্যকরণীয় দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে। সারা সপ্তাহ ধরিয়া ইহার পাঠ চলিত। একই প্রবন্ধ একাধিকবার পাঠ করিতাম। নিজে পড়িয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম না, অপরকে পড়িতে দিতাম এবং

৬

বন্ধুদের পড়িয়া শুনাইতাম। পরবর্তী সংখ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিতাম অধীর আগ্রহে।

আমাদের সেই ছোট্ট শহরে 'যুগান্তর' প্রচারের ভার আমি নিজ হইতেই লইয়াছিলাম। তৎকালে 'যুগান্তর'কে সংহার করিবার জন্য রাজ-খড়গ আঘাত হানিতেছিল। বিপ্লবের 'মত ও পথ' গ্রহণে আমি বিশেষ ভাবে প্রেরণা পাইয়াছিলাম 'যুগান্তর', অরবিন্দ ও বোমার মামলার কাহিনী হইতে। এই তিনের সমাবেশে বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আমার নিষ্ঠা ও আকর্ষণ দ্রুত-গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই তিনটিকে আমার বৈপ্লবিক জীবন-দর্শনের ত্রয়ী বলা যাইতে পারে।

আমার সক্রিয় বৈপ্লবিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোমার মামলার বিচার চলিতে থাকা কালে। তখন আমি নোয়াখালী জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পঞ্চম মান (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। সেই বৎসরই কলিকাতা ন্যাশন্যাল কলেজে ষষ্ঠ মানে (আই.-এ. প্রথম বর্ষ) আমার ভর্তি হইবার কথা ছিল। কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠে নাই, কেননা আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছিল আমাদের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের কাজে। পরবর্তী বৎসরের প্রথম দিকও বৈপ্লবিক কার্যে কাটাইতে হইল।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আমি কলিকাতা ন্যাশন্যাল কলেজে ভর্তি হইলাম। ওই বৎসরের ৬ই মে আলিপুর বোমার মামলার রায় প্রকাশিত হইল। বিচারাধীন আসামী স্বরূপ কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল কারাবাসের পর শ্রীঅরবিন্দ সসম্মানে মুক্তি পাইলেন। মহান্ লোকনায়কের মুক্তিতে তাঁহার স্বদেশবাসিগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। শ্রীঅরবিন্দ তখন শুধু আমার নহে, আমার ন্যায় এম্‌নি বহু বিপ্লব-পন্থী মুক্তিকামী তরুণ সাধকের অন্তর্লোকে নিত্য-পূজিত জাগ্রত জীবন্ত দেবতা।

কারামুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ আসিয়া উঠিলেন ৬নং কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার মেসো মহাশয় 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ীতে। মিত্রমহাশয় তৎকালে আগ্রার কারাগারে রাজবন্দী স্বরূপ নির্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন। রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, য়্যান্‌টি সার্কুলার সোসাইটির সম্পাদক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রভৃতি আরও আটজন নেতা একই সময়ে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। কারাগারের বাহিরে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দ দেখিতে পাইলেন, বিদেশী রাজের দমন-নীতি প্রয়োগের ফলে দেশের রাজনীতিক জীবনে অবসাদ আসিয়াছে এবং নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কর্ম্মিগণ দিশাহারা হইয়াই পথ হাতড়াইয়া ঘুরিতেছে। মধ্যপন্থী (মডারেট) দলের নেতৃত্ব—জাতিকে কোনো পথের সন্ধান দিতে পারিল না। সে সময় মধ্যপন্থী দল প্রস্তাবিত মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার লইয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে মধ্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদী (ন্যাশন্যালিস্ট্) দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেসের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে দুইটি দলের মাঝখানে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, উহার দূরত্ব আরও বাড়িয়া গেল।

সাত

এইরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের অবসন্ন রাজনীতিক জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন শ্রীঅরবিন্দ। আশার আলোক-বর্তিকা জ্বালাইয়া তিনি কর্ম্মিগণকে পথের সন্ধান দিলেন। তাঁহার ভাষণ ও রচনার মধ্য দিয়া নির্যাতিত দেশবাসীকে শুনাইতে লাগিলেন অভয়-বাণী। সেই বৎসরেরই মধ্যভাগে শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কর্মযোগিন্' প্রকাশিত হইল। ইহার মাসাধিক কাল পরে তাঁহার সম্পাদনায় 'ধর্ম্ম' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রও প্রকাশিত হয়। উত্তর কলিকাতার

৪নং শ্যামপুকুর লেনে ছিল 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকার কার্যালয়। এই পত্রিকা দুইখানিতে রাজনীতির আলোচনা ত থাকিতই, তাহা ব্যতীত ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির আলোচনাও থাকিত। রাজনীতির আদর্শ, 'মত ও পথে'র দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহা সুস্পষ্টরূপেই দেখা যাইবে যে, 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ এবং 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধানের সৃষ্টি হয় নাই, এবং 'বন্দে মাতরম্'-এর শ্রীঅরবিন্দের কোন রূপান্তর ঘটে নাই।

এই দুইখানি পত্রিকার মাধ্যমে তিনি পূর্বের ন্যায় নির্ভীক ভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রচার করিতে লাগিলেন,—মধ্যপন্থী বা 'মডারেট' দলের রাজ-দরবারে আবেদন-নিবেদন নীতির ('বন্দে মাতরম্'-এর ভাষায় 'Policy of mendicancy' অর্থাৎ ভিক্ষুকের নীতির) নিষ্ফলতা, লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিবার জন্য আত্মশক্তির বিকাশ ও তাহার উপর নির্ভরের প্রয়োজন, এবং স্বরাজ-লাভের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ ও চরম ত্যাগ স্বীকারের আবশ্যকতা। আমাদের স্বরাজের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা—বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন,—"Our ideal of Swaraj is absolute autonomy—absolute self-rule free from foreign control."—ইহা তিনি পুনরায় প্রচার করিলেন 'কর্মযোগিন্'-এর মধ্য দিয়া। জাতীয়তাবাদী বা ন্যাশন্যালিস্ট দলের স্বরাজের এই আদর্শ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রচারিত আদর্শেরই পুনরাবৃত্তি। এই আদর্শকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য মন্দীভূত স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত করিতে হইবে, সালিসের সাহায্যে মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি এবং জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এমন কি, প্রয়োজন হইলে 'প্যাসিভ্ রেজিস্টেন্স্' (Passive Resistance) নীতি প্রয়োগের জন্যও জাতিকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই সমুদয় বিষয় প্রচার করিতে শ্রীঅরবিন্দ দ্বিধা করেন নাই।

আজও স্পষ্ট মনে আছে, এই 'Passive Resistance'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ', 'ধর্ম' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে, পূর্বোক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা দুইখানির সম্পাদনায় শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদকীয় লেখনী নিরঙ্কুশ ভাবে চালনা করিতেন না। তাঁহার মতামত প্রকাশে স্পষ্টতা ও নির্ভীকতা হ্রাস পায় নাই এবং সতেজ ভঙ্গীও বদলায় নাই; কিন্তু তাহাতে সতর্কতার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। রাজদ্রোহ আইনের বেড়াজালে তাঁহাকে যাহাতে সহজে আটকাইতে না পারে, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। ইহার পরিষ্কার প্রমাণ মিলিবে 'কর্মযোগিন্'-এর রাজদ্রোহের মামলার প্রবন্ধটি হইতে।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের স্বাক্ষরে "To my countrymen"—'আমার দেশবাসীর সমীপে' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং মুদ্রাকর-প্রকাশক মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইল। পুলিস শ্রীঅরবিন্দের কোন সন্ধান পাইল না। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মুদ্রাকর-প্রকাশকের বিচার-কালে সরকার পক্ষ হইতে শ্রীঅরবিন্দকে 'ফেরারী আসামী' বলিয়া বর্ণনা করা হইল। বিচারে সিদ্ধান্ত হইল প্রবন্ধটি রাজদ্রোহাত্মক এবং ১৮ই জুন মনোমোহন ঘোষ মুদ্রাকর-প্রকাশক বলিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিন্তু হাইকোর্টে, আপিলে সাব্যস্ত হইল যে, প্রবন্ধটি রাজদ্রোহাত্মক নহে। ফলে, মুদ্রাকর-প্রকাশকের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের প্রদত্ত দণ্ডাদেশ ৭ই নভেম্বর বাতিল হইয়া গেল এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হইল। আপিলের শুনানী-কালে বিচারপতি হোম্‌উড্ সরকার পক্ষের বিতর্কের জবাবে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন ঃ

"The author of the present article may be a very ingenious and subtle master of language—there are indications throughout the article that he is."

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারী-প্রয়াণের মূলে রহিয়াছে পূর্বোক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কিত রাজদ্রোহের অভিযোগ।

আট

আমার কলিকাতায় ন্যাশন্যাল কলেজে ভর্তি হইবার পূর্বেই বিখ্যাত ছাত্র-প্রতিষ্ঠান য়্যান্‌টি সার্কুলার সোসাইটি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির সঙ্গে কর্মীদের আবাস 'ব্যারাক' স্বাভাবিক নিয়মেই লোপ পাইয়াছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পূর্ব দিকে ৪৪।১নং কলেজ স্ট্রীটের একটা মেসে আমি আস্তানা গাড়িলাম। সে-যুগে ছাত্রের অধ্যয়নই একমাত্র তপস্যা ছিল না ; অধ্যয়নের সঙ্গে স্বদেশ-সেবার তপস্যাও যুগপৎ চলিত। আমারও পড়াশুনা এবং বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের কাজ একই সঙ্গে চলিতেছিল। এই দুইটির মধ্যে একটি মুখ্য এবং অপরটি গৌণ ছিল না। আমার কাছে দুই কাজই ছিল মুখ্য।

মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে (৬নং কলেজ স্কোয়ারে) সেই সময় আমার আসা-যাওয়া ছিল একপ্রকার নিয়মিত। কৃষ্ণবাবু নির্বাসনে ছিলেন বলিয়া তাঁহার পরিবারের তত্ত্বতালাশ করা আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করিতাম। একটা কাজ আমাকে প্রায় প্রতিদিনই করিতে হইত। কৃষ্ণবাবুর নির্বাসনের পর হইতে তাঁহার সহধর্মিণী লীলাবতী মিত্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। চিকিৎসক উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় যেন তাঁহার গঙ্গা-তীরে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বেড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। একটা বাড়ীর গাড়ী যোগাড় করা হইয়াছিল। সেই ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে

আমি লইয়া যাইতাম গঙ্গা-তীরে ইডেন গার্ডেনের ধারে। সঙ্গে থাকিতেন তাহার দুই কন্যা। স্বর্গীয়া কুমুদিনী মিত্র (বসু) এবং শ্রীবাসন্তী মিত্র (চক্রবর্তী)। কোন কোন দিন কন্যাদের মধ্যে একজন থাকিতেন, আর থাকিতেন শ্রীঅরবিন্দের সহোদরা ভগিনী শ্রীসরোজিনী ঘোষ।

ওই বাড়ীতে তখন আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল অরবিন্দ। কারামুক্তির পর হইতে আরম্ভ করিয়া 'কর্মযোগিন্'-এর মামলা সম্পর্কে আত্মগোপন ও অজ্ঞাতবাসের জন্য চন্দননগর যাত্রার দিন পর্যন্ত তিনি তাঁহার মেসোমহাশয়ের বাড়ীতেই ছিলেন। সে বাড়ী তখন আমার কাছে ছিল দেবায়তনের মতো। সেখানে আমার দেবতার দর্শন মিলিত, কোনো কোনো দিন দেবতার সাময়িক সান্নিধ্যও লাভ করিয়াছি। দেখিতাম, মিত্র মহাশয়ের ছেলে-মেয়েরা এবং বাড়ীর আরো দুই-একজন শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া উপস্থিত কোন বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। যতদূর স্মরণ হয় দেশের তৎকালীন রাজনীতিক কোন ঘটনা কিংবা পরিস্থিতি নিয়াই আলোচনা হইত। আমি সেই সুযোগে নির্বাক শ্রোতার আসনে বসিয়া যাইতাম,—আলোচনা শুনিবার ঔৎসুক্যে নহে, শ্রীঅরবিন্দের বাণী শুনিবার ঐকান্তিক আগ্রহে। শ্রীঅরবিন্দ স্বভাবতই মিতভাষী। তিনি শুনিয়া যাইতেন বেশীর ভাগ, মাঝে-মাঝে দুই-একটি মন্তব্য করিতেন স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে। আলোচনার সমাপ্তিতে বুঝিতাম যে, শ্রীঅরবিন্দের মতামত জানিয়া লইবার জন্যই আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছিল।

নয়

এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কারামুক্তির পরে শ্রীঅরবিন্দের বৈপ্লবিক মতের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তিনি

তাঁহার অনুসৃত বিপ্লবের পথও পরিত্যাগ করেন নাই। ভারত-বিশ্রুত বিপ্লবী নায়ক শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) তখন শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ মতে যুগান্তর বিপ্লবী দলকে পরিচালনা করিতেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী গোয়েন্দা পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ সামসুল আলাম শহীদ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তের পিস্তলের গুলীতে নিহত হইলে সেই সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিছুকাল হাজতবাসের পর প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান। তৎকালে এই হত্যা সম্পর্কে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হইতে পারে বলিয়া গুজব রটিয়াছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বর জিলায় বুড়ীবালাম তীরে যতীন্দ্রনাথ তাঁহার চারিজন সহকর্মী (চিত্তপ্রিয়, নীরেন, জ্যোতিষ, মনোরঞ্জন) সহ শত্রুপক্ষের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণবাবুর পুত্র শ্রীসুকুমার মিত্র পূর্ব হইতে যুগান্তর বিপ্লবী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আলিপুর বোমার মামলার সূত্রপাত হইতে তাঁহার উপর পুলিসের কড়া নজরের ব্যবস্থা হয়। সুকুমারবাবু সাইকেলে বেশী যাতায়াত করিতেন। সেই জন্য দুই জন সাইকেলিস্ট্‌ গোয়েন্দা তাঁহাদের বাড়ীর (সঞ্জীবনী কার্যালয়ের) সম্মুখে, কলেজ স্কোয়ারে ভোর পাঁচটা কি ছয়টা হইতে রাত্রি প্রায় এগারোটা পর্যন্ত পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। বাড়ীর বাহির হইলে ইহারা সুকুমারবাবুর অনুসরণ করিত। দুই জন সাইকেলিস্টের সঙ্গে আরো তিন-চারি জন পদাতিক গোয়েন্দাও থাকিত। প্রয়োজন মতে তিনি ইহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া চলা-ফেরা করিতেন। তিনি অতি দ্রুত-গতিতে সাইকেল চালাইতে পারিতেন। গোয়েন্দারা সাইকেল লইয়া কলেজ স্কোয়ার পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িবার পূর্বেই সুকুমারবাবু রাস্তার বাঁক ছাড়াইয়া গলিতে কিংবা অন্য রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িতেন ; এবং অনুসরণকারীদের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেন।

আমিও তখন পুলিসের নজরবন্দী। তবে আমার উপর তখন পর্যন্ত এতটা কড়া নজর ছিল না। সপ্তাহে দুই তিন বার গোয়েন্দা বিভাগের লোক মেসে আসিয়া খোঁজ-খবর লইয়া যাইত। কিন্তু কোন গোয়েন্দাকে আমার অনুসরণ করিতে দেখি নাই। এই কারণে আমার পক্ষে গুপ্ত সমিতির কাজ করিতে অসুবিধা কম ছিল। আমাদের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের গুপ্ত-চক্রের পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে নোয়াখালী জিলার যুগীদিয়ার জমিদার স্বর্গীয় হেমচন্দ্র দাসগুপ্তও ছিলেন। তিনি গুপ্ত সমিতির কাজে এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যে মুক্ত হস্তে অর্থদান করিতেন। তিনি ধার্মিক, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ও সৎসাহসী ছিলেন। প্রকাশ্য রাজনীতিক আন্দোলনের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। নোয়াখালীর জনজীবনে তিনি ছিলেন একজন অগ্রগামী নেতা।

সন্ত্রাসবাদের (Terorism-এর) পন্থা অবলম্বন করিয়া বিদেশী রাজার গোয়েন্দা বিভাগকে অচল কিংবা তুর্বল করিয়া দিবার প্রচেষ্টা সফল হইবে কিনা, তৎসম্বন্ধে হেমবাবুর মনে সংশয় ছিল। শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহার সংশয় দূর করার জন্য আমি সুকুমারবাবুকে অনুরোধ জানাইলাম। তিনি আমাদের গুপ্ত সমিতির কথা এবং উহার সহিত আমার সম্পর্কের বিষয় জানিতেন। সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তখন কি মত পোষণ করিতেন, তাহা আমি অবগত ছিলাম অন্য সূত্রে। সুকুমারবাবু শ্রীঅরবিন্দের সহিত হেমবাবুর ও আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

নির্ধারিত দিবসে সন্ধ্যার পর হেমবাবুকে লইয়া আমি ৬নং শ্যামপুকুর লেনে 'কর্মযোগিন্' কার্যালয়ে যাইয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সে তারিখটি আমার স্মরণ নাই। তবে মনে পড়ে সামসুল আলামের নিধনের দিন কয়েক পরে এই সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। আমাদের কথাবার্তার সময় আমরা তিন জন ভিন্ন সেই ঘরে অন্য কেহ ছিলেন না। আধ ঘণ্টা কি তাহা

অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী সময় কথাবার্তা চলিয়াছিল। আলোচনা-কালে আমি শ্রীঅরবিন্দকে সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। আমার প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজনও ছিল না, কেননা আলোচ্য বিষয়ে আমার মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না; বিশেষতঃ শ্রীঅরবিন্দের কথাকে আমি দেব-বাণী বলিয়া জানি। হেমবাবুর সঙ্গে এই বিষয় নিয়া আমার পূর্বে কয়েকবারই আলোচনা হইয়াছিল। সুতরাং আলোচনা-কালে তাঁহাকে শুধু তাঁহার জিজ্ঞাস্য কোন কোন কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সহিত শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনিয়া গেলেন; তর্ক-বিতর্ক যাহাকে বলে তাহা করেন নাই। মাঝে-মাঝে জ্ঞাতব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করাইয়া লইবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন মাত্র।

সাধারণতঃ রাজনীতিক নেতাদের বাচন-ভঙ্গী যেমন হইয়া থাকে, শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতিক নেতা হইলেও বাচন-ভঙ্গী ছিল একেবারে স্বতন্ত্র রকমের। তাঁহার কথায় ভাবাবেগ ছিল না, ছিল জোরালো যুক্তি। বক্তব্যের কোনো বিশেষ অংশের উপর যদিও তিনি জোর দিয়া কথা বলেন নাই, তথাপি তাঁহার কথা শ্রোতার মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের কথায় ছিল একটা অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণা, আর সত্যদ্রষ্টা ঋষির সত্যানুভূতির প্রকাশ। যে মত তিনি পোষণ করিতেন ও যে পথ অনুসরণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল অবিচলিত এবং ইহার সাফল্য সম্বন্ধেও তাঁহার আশা ছিল সুনিশ্চিত।

আলোচনা শেষ হইলে শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হেমবাবু ও আমি বাড়ি ফিরিলাম। বুঝিতে পারিলাম হেমবাবুর সংশয় কাটিয়া গিয়াছে।

দশ

আমাদের পূর্বোক্ত সাক্ষাতের কয়েক দিন পরে (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে) শ্রীঅরবিন্দ অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। গোয়েন্দা পুলিস তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চেষ্টার কিছু মাত্র ত্রুটি করিল না। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল, কোথায়ও তাঁহার সন্ধান মেলে নাই।

গোয়েন্দা পুলিসের সদা-সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া শ্রীঅরবিন্দ চলিয়া গেলেন বৃটিশ ভারতের বাহিরে ফরাসী চন্দননগর। তাঁহার চন্দননগর গমনের বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকার সহকারী রামচন্দ্র মজুমদার একদিন রাত্রি প্রায় আটটায় ৪নং শ্যামপুকুর লেনের বাড়ীতে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দকে জানাইলেন যে, তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। কোন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীর নিকট হইতে রামবাবু এই সংবাদ পাইয়াছেন এবং সংবাদ বিশ্বাস যোগ্য, ইহাও তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বলিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সামান্য একটু ভাবিয়া নিয়া কহিলেন যে, তিনি চন্দননগর যাইবেন এবং অবিলম্বে যেন সেই ব্যবস্থা করা হয়। রামবাবু তখন শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া অলিগলির মধ্য দিয়া বাগবাজারে গঙ্গার ঘাটে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। রামবাবু একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে নৌকায় উঠাইয়া দেন। নৌকায় সহযাত্রী হইলেন সুরেশবাবু ও বীরেনবাবু। রামবাবু শ্রীঅরবিন্দের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

পরদিন ভোরবেলা তাঁহারা তিন জনে চন্দননগর পৌঁছেন। চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায় শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে সম্মত হন নাই। তাঁহাকে সশ্রদ্ধ সমাদরে আশ্রয় দিলেন মতিলাল রায়। সুরেশবাবু ও বীরেনবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে পৌঁছানর এবং পণ্ডিচেরী যাত্রার জন্য

চন্দননগর ছাড়িয়া আসিবার তারিখ জানাইবার জন্য শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে ১৬।৫।৫০ তারিখের চিঠিতে তিনি আমাকে লিখিয়াছেন ঃ

......"শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী পূজার পরদিন আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৩১শে মার্চ রাত্রে তাঁহাকে নৌকায় চড়াইয়া দিই। ১লা এপ্রিল 'ডুপ্লেসক্' ছাড়ে। ৪ঠা এপ্রিল যথাসময়ে পণ্ডিচেরী গিয়া তিনি পৌঁছান।"......

পূর্বোক্ত বিবরণ আহরণ করিয়াছি সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত (প্রবাসী—১৩৫২ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত) "অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে।* উহাতে যে তিন জনের কথা আছে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। তিন জনই যুগান্তর বিপ্লবী দলের সদস্য। সুরেশচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য। বীরেন্দ্রনাথ আলিপুর বোমার মামলার আসামী ছিলেন। আসামীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ। তাঁহার নিবাস ছিল যশোহর জিলায়। বিচারে তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে বাস করেন।

সুরেশবাবুর পিতা রংপুরের নির্যাতিত কংগ্রেস-নেতা স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তীও যুগান্তর বিপ্লবী দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। আলিপুর বোমার মামলার সংস্রবে চক্রবর্তী মহাশয়

---

*শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর গমন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের বিশদ বিবরণ জানিবার জন্য যাঁহারা কৌতূহলী, তাঁহারা সুরেশবাবুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, স্বর্গীয় রামচন্দ্র মজুমদার লিখিত (প্রবাসী-১৩৫২ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত) "অপ্রকাশিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা" এবং শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত লিখিত (প্রবাসী-১৩৫২ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত) আলোচনা বিভাগে "শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে" প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। তবে নলিনীবাবু পরিশেষে সুরেশবাবুকেই সমর্থন করিয়াছেন।—লেখক

গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। কিছুকাল হাজতবাসের পর তিনি প্রমাণা-ভাবে মুক্তি পান; কিন্তু রংপুর কালেক্টরীর সরকারী চাকরী হইতে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তীও এই দলের সদস্য ছিলেন। দেওঘরের এক নির্জন পাহাড়ে বোমা নিক্ষেপ করিয়া বোমার শক্তি পরীক্ষা উপলক্ষ্যে তিনি দুর্ঘটনায় নিহত হন। সুরেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একজন যশস্বী লেখক। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-প্রবাসের সময় হইতে তিনি তথায় 'শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে' বাস করিতেছেন। 'প্রবাসী'র প্রবন্ধটির লেখক হইলেন এই সুরেশচন্দ্র।

রামবাবু শ্রীঅরবিন্দের একজন ভক্ত। তিনি যুগান্তর বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা স্বনামখ্যাত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একজন সহকর্মী। সিডিশন কমিটির (রাউলাট কমিটি নামেও পরিচিত) রিপোর্টে অমরবাবুর সঙ্গে রামবাবুর উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রামবাবু প্রায় পাঁচ বৎসর কাল রাজবন্দী (State prisoner) স্বরূপ কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর চলিয়া যাওয়া এবং তথায় মতিবাবুর বাড়ীতে থাকার কথা আমি জানিতে পারিয়াছি তাঁহার পণ্ডিচেরী চলিয়া যাইবার দিন কয়েক পরে। সুকুমার মিত্র তাঁহার 'অরো দা' চন্দননগর রওনা হইয়া যাইবার পর সেই রাত্রিতেই সংবাদটি অবগত হইয়াছিলেন। রামবাবু 'সঞ্জীবনী' কার্যালয়ে যাইয়া তাঁহাকে এই খবর দিয়া আসেন। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর পৌঁছিবার পর সুকুমার বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। জামা-কাপড়, পুস্তক, টাকা-পয়সা ইত্যাদি তিনি সুকুমারবাবুর কাছ হইতে নেওয়াইতেন।

এগার

মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর হইতে তাঁহার মাসতুত ভাই সুকুমার মিত্রকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাকে যেন শীঘ্রই

বৃটিশ ভারতের বাহিরে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। স্থান নির্বাচন, জল-পথে কি স্থল-পথে গমন, যাত্রার দিন নির্ধারণ, চন্দননগর হইতে শ্রীঅরবিন্দকে কলিকাতায় কি ভাবে আনা হইবে, অর্থ সংগ্রহ, তাঁহার উপর শ্রীঅরবিন্দের ন্যস্ত কার্য সম্পাদনের জন্য বিশ্বস্ত কর্মী বাছাই ইত্যাদি কাজগুলি করার দায়িত্ব সুকুমার-দাকেই নিতে হইয়াছিল। তিনি একাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন। পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সতর্কতামূলক যাবতীয় সম্ভাব্য উপায়ও তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তৎকালে সুকুমার-দা যুবক ; কিন্তু বয়সের তুলনায় তাঁহার বেশ গাম্ভীর্য ছিল এবং তাঁহার মন্ত্র-গুপ্তির ক্ষমতাও ছিল প্রশংসনীয়। গোয়েন্দা পুলিশের অর্ধ-ডজন বা ততোধিক গুপ্তচর কর্তৃক নিদ্রার সময় ব্যতীত দিবারাত্রি নজরবন্দী থাকিয়াও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাঁহার উপর 'অরো-দা'র অর্পিত এই কঠিন কার্যটি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন সুকুমার-দা আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে ('সঞ্জীবনী' কার্যালয়ে) একটা কোঠায় দুইটি স্টীল-ট্রাঙ্ক দেখাইয়া বলিলেন যে, ওই দুইটি যেন আমার মেসে নিয়া রাখি। ট্রাঙ্ক দুইটি খানিকটা তুলিয়া ধরিয়া বুঝিয়া নিলাম জিনিসপত্র-বোঝাই। পরিহাসের ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ওই বাক্স দুইটার ভিতরে বোমা পিস্তল আছে কিনা ? সুকুমার-দা হাসিয়া বলিলেন যে, যাই থাকুক না কেন, বাক্স দুইটা যেন আমার কাছেই রাখি। ট্রাঙ্ক দুইটি আমার মেসে (৪৪।১ কলেজ স্ট্রীটে) স্থানান্তরিত করিলাম। পর দিবস নির্ধারিত সময়ে আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন।

পরদিন যথা সময়ে সুকুমার-দার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি আমাকে দুই ব্যক্তির নাম-ধাম লিখিয়া দিয়া এবং প্রয়োজনীয়

টাকা বুঝাইয়া দিয়া কলোম্বো-গামী জাহাজে দুইখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনিয়া আনিতে বলিলেন। টিকেট পণ্ডিচেরীর কিনিয়াছিলাম, কি কলোম্বোর কিনিয়াছিলাম, তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। সুকুমার-দার স্মরণ আছে যে, তিনি কলোম্বোর টিকেটই কিনাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা স্বরূপই তিনি ইহা করিয়াছিলেন। যাত্রী দুই জনের গন্তব্য স্থল পণ্ডিচেরী, কিন্তু টিকেট হইল কলোম্বোর। সুতরাং তদন্ত-কালে পুলিসের দৃষ্টি প্রথমে কলোম্বোর দিকেই পড়িবার কথা। জাহাজ কোম্পানীর নাম আমার মনে নাই, কিন্তু সুকুমার-দার আজ পর্যন্তও তাহা মনে আছে। সেই কোম্পানীর নাম হইল—'Messageries Maritimes'. তবে যে জাহাজে দেবতা-বিদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই জাহাজের নাম আমি ভুলি নাই! ইডেন গার্ডেনের সন্নিকটে গঙ্গা-বক্ষে ভাসমান সেই 'ডুপ্লেক্স্' (Dupleix) জাহাজখানা আজও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে।

সুকুমার-দা বলিয়া দিয়াছিলেন, মাত্র দুই জন যাত্রীর স্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে এমন একটা ক্যাবিন্ যেন ঠিক করি। জাহাজ কর্তৃপক্ষকে বলিয়া আমি টিকেট কিনিবার সঙ্গে-সঙ্গে সেইরূপ বন্দোবস্তই করিয়া গেলাম। 'সঞ্জীবনী' কার্যালয়ে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে টিকেট দুইখানি ও উদ্বৃত্ত টাকা ফেরত দিলাম, এবং জানাইলাম যে, তাঁহার উপদেশ মতে ক্যাবিন্ ঠিক করা হইয়াছে। টিকেট দুইখানি দেখিয়া নিয়া আমাকে ফেরত দিয়া বলিলেন,—"তোমার কাছেই রেখে দাও এখন, পরে চেয়ে নেব।" ইহার পূর্বে সুকুমার-দা দুইটা জিনিসপত্র-ভর্তি ট্রাঙ্ক রাখিতে দিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়া দিয়াছিলেন্ যে, ঐগুলিতে বোমা-রিভল্‌ভার নাই। আজ আবার কলোম্বোর টিকেট কিনাইলেন এবং সেই টিকেট আমাকেই রাখিয়া দিতে বলিলেন। এই

বিষয়গুলি আমাকে কিঞ্চিৎ ভাবাইয়া তুলিল। ব্যাপার যে কি, তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

বার

একদিন কি দুইদিন পরের কথা। সেদিনটি ছিল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা এপ্রিল। সকালের দিকে সুকুমার-দা ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি উপস্থিত হইলে বলিলেন,—'আজ দুপুর বেলা তুমি আর সুরেন বাগবাজারের ঘাট থেকে একখানা নৌকা ক'রে গঙ্গার ওপারে···ঘাটে চ'লে যাবে। ট্রাঙ্ক দুইটা এখনই গিয়ে জাহাজের ক্যাবিনে রেখে আসবে। টিকেট দু'খানা সঙ্গে নিয়ে যেও। সে-ঘাটে একখানা নৌকা থেকে দু'জন লোক তোমাদের নৌকায় উঠবেন। তাঁদের কলোম্বোর জাহাজে তুলে দিয়ে আস্‌বে।' আমি প্রশ্ন করিলাম,—নৌকার লোককে চিন্‌ব কি ক'রে? তিনি বলিলেন,—'সুরেনকে সব ব'লে দিয়েছি।' সুকুমার-দার কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ একটা কথা আমার মনের মধ্যে বিজলী-চমকের মত ক্ষণেকের জন্য আলোকসম্পাত করিয়া গেল। তখনই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনার 'অরো-দা' যাচ্ছেন না ত? তিনি একটু বিস্মিত হইয়া হাসিয়া জবাব দিলেন,—'বেশ বুদ্ধি হয়েছে ত দেখ্‌ছি।—কি ক'রে বুঝলে?' 'এম্‌নি কেন জানি মনে হ'ল'; উত্তরে কহিলাম। তিনি বলিলেন,—'ঠিকই ধরেছ; সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে।' গঙ্গার পরপারে উত্তরপাড়ায় কিংবা বালীতে যে ঘাটের কথা সুকুমার-দা বলিয়া দিয়াছিলেন, উহার নাম আমার স্মরণ নাই, সুকুমার-দারও নাই।

সুকুমার-দার কথিত সুরেন (সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী) এবং আমি একই মেসে থাকিতাম। সুরেনবাবু আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমরা দুইজন একই জিলার। স্বদেশী আন্দোলনের বৎসর তিনি

ছিলেন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তখন কলেজের পড়া ছাড়িয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালের বিখ্যাত ছাত্র-প্রতিষ্ঠান য়্যান্‌টি-সার্কুলার সোসাইটির তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট কর্মী। সুরেনবাবু কিছুকাল ন্যাশন্যাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। স্বদেশী আন্দোলনে যখন ভাঁটা পড়ে এবং সোসাইটি উঠিয়া যায়, তখন তিনি আবার ন্যাশন্যাল কলেজ ছাড়িয়া দিয়া সুকুমার-দার উপদেশ মতে বি. এস্‌-সি. ক্লাসে ভর্তি হন এবং যথাসময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রি লাভ করেন। ইহার পর সুরেনবাবু সাংবাদিক ও শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন। 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক নির্বাতিত দেশ-সেবক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর মৃত্যুর পর সুরেনবাবু সেই পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার পণ্ডিচেরীর সহযাত্রী বিজয় নাগকে সুকুমার-দার কথিত ঘাটে চন্দননগর হইতে নৌকায় করিয়া পৌঁছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন মতিলাল রায়। সেখান হইতে নৌকা পরিবর্তনের কথা হইয়াছিল সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুরেনবাবু ও আমি গঙ্গার ও-পারের ঘাটে পৌঁছিতে পারি নাই। কি কারণে যে আমাদের গঙ্গা পাড়ি দিতে বিলম্ব হইল, তাহা মনে পড়িতেছে না। আমাদের দেরী দেখিয়া শ্রীঅরবিন্দের নৌকা রওনা হইয়া গেল চাঁদপাল ঘাটের দিকে, যেখান হইতে কলোম্বোগামী জাহাজ ছাড়িবার কথা। আমরাও তাঁহাদের দেখা না পাইয়া 'সঞ্জীবনী' কার্যালয়ে ফিরিয়া আসিবার জন্য নদী পাড়ি দিলাম। আমাদের বিলম্বের দরুন যে বিভ্রাট ঘটিল এবং তাহা পরে কি প্রকারে

যে কাটাইয়া উঠিলাম, সেই কাহিনী পাঠক-পাঠিকারা প্রথমে শুনিবেন বাংলার প্রবীণ জননায়ক অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে।

তের

যাঁহার কাছ হইতে এখন কাহিনী শুনিতে পাইবেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই স্থলে কিঞ্চিৎ বলিয়া নিলে, তাহা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অমরেন্দ্রনাথ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইলেও এ-কালের অনেকে ভারতের মুক্তি-সাধনায় তাঁহার অমূল্য অবদানের কথা হয়ত বিদিত নহেন। হুগলী-উত্তরপাড়ার এই আদর্শ দেশ সেবকের নাম আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এই প্রবন্ধের একস্থলে রামচন্দ্র মজুমদারের প্রসঙ্গে। তাঁহার রাজনীতিক জীবনের আরম্ভ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। তখন তিনি দেশ-সেবার ব্রতে দীক্ষা নিয়াছিলেন ভারতীয় স্বাদেশিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন বিপ্লবের অগ্নি-মন্ত্রে। তখন হইতে গান্ধী-যুগের আরম্ভ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ বিপ্লবের দুর্গম পথের যাত্রী ছিলেন।

পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাংলার বিপ্লবীদের চেষ্টায় ও নেতৃত্বে সর্বভারতীয় সংযুক্ত বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। তৎকালে জার্মানীর সাহায্যে ভারতীয় বিপ্লবীরা বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়াছিলেন, উহার সহিত তিনি সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য পুলিসের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল তাঁহাকে পলাতক বিপ্লবীর জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধান্তে মণ্টেগো-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইবার

প্রাক্কালে সরকারী দমন-নীতি পরিহার করা হইলে অমরেন্দ্রনাথের পলাতক জীবনের দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটে।

কিন্তু বিরাম বা বিশ্রাম ভোগ, কিংবা রাজনীতিক কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ তাঁহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখেন নাই। গান্ধী-যুগে তিনি বিপ্লবের গুপ্ত পথ ছাড়িয়া দিয়া প্রগতিশীল কংগ্রেসের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং পরিণত বয়সে আবার তরুণের উদ্যমে স্বদেশের মুক্তি-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তিনি ৺পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রার্থী স্বরূপ নির্বাচিত হইয়া প্রায় দশ বৎসর দক্ষতার সহিত আপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

উত্তরপাড়ার স্বনামখ্যাত দেশহিতৈষী জমিদার ৺রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র দেশভক্ত ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মিছ্‌রিবাবু) ছিলেন অমরেন্দ্রনাথের অন্যতম সহকর্মী ও বন্ধু। রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের ন্যায় মিছ্‌রিবাবুও যুগান্তর বিপ্লবী-দলের কাজে মুক্ত-হস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। আলিপুর বোমার মামলার রাজ-সাক্ষী (Approver) নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (পরে শহীদ কানাইলাল দত্ত ও শহীদ সত্যেন বসুর হস্তে নিহত) তাহার স্বীকারোক্তিতে মিছ্‌রিবাবুকে বিপ্লবীদলের সহিত জড়িত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার স্বীকারোক্তির পোষকতায় আর কোন প্রমাণ ছিল না বলিয়া মিছ্‌রিবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ৺রাসবিহারী বসু, শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শহীদ বসন্তকুমার বিশ্বাস, মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন ভট্টাচার্য), মতিলাল রায় প্রভৃতি অমরেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক কর্মজীবনের সহকর্মী ছিলেন।

কলিকাতায় কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগ-স্থলে ওয়াই. এম. সি. এ.-এর নীচে ছিল তাঁহার স্থাপিত ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠান 'শ্রমজীবী সমবায়'। এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রায় সমস্ত অর্থই তিনি ব্যয় করিতেন বিপ্লবের কাজে ও বিপ্লবী সহকর্মীদের সাহায্যে। সমবায়-গৃহ ছিল বিশিষ্ট বিপ্লবীদের একটি প্রধান মিলন-কেন্দ্র। ব্যবসায়ের সহিত রাজনীতি মিশ্রিত হইলে যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। বৈপ্লবিক অভিযানে প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা মিটাইতে যাইয়া পরে শ্রমজীবী সমবায়ের মূলধনেও হাত পড়িয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ নিজে ঋণ করিয়া বিপ্লবের কাজে অর্থ দিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে সেই দুর্বহ ঋণের বোঝা বহিতে হইয়াছে। কিন্তু এই জন্য কেহ কোন দিন তাঁহার মুখে বাহাদুরির কথা কিংবা খেদোক্তি শুনিতে পান নাই।

এই দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ-গঠন, গৌরকান্তি, সৌম্যমূর্তি ও প্রিয়দর্শন মানুষটি অয়স্কান্ত প্রস্তরের মত কর্মক্ষেত্রে বড়-ছোট সমস্ত সহকর্মীকে আকর্ষণ করিতেন। বয়ঃকনিষ্ঠ কর্মী মাত্রেরই তিনি হইলেন পরম শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় 'অমর-দা'। সদা-প্রফুল্ল, শান্ত-স্বভাব, মিষ্টভাষী ও প্রশস্ত-হৃদয় 'অমর-দা'র সঙ্গে কাহারও মতান্তরে মনান্তর ঘটিতে শুনি নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার বিরোধী দলের কাহারও মুখে কোনো দিন তাঁহার নিন্দা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাইয়াও তিনি মাথায় টিকি রাখিয়া আসিতেন। সে টিকি কৃশাঙ্গ নহে যে, ইচ্ছামত চিরুনি বা ব্রাস্ দিয়া আঁচড়াইয়া চুলের সঙ্গে মিশাইয়া অদৃশ্য করা যায়। উহা ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণের শিরোপরি লম্বমান শিখার ন্যায় দীর্ঘ ও স্থূলাকৃতি। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের এই জয়-ধ্বজা অমরেন্দ্রনাথের শীর্ষদেশে সগৌরবে ও সগর্বে বিরাজমান থাকিলেও, তাঁহার মধ্যে গোঁড়ামি বা অনুদার ভাব কোন দিন দেখিতে পাই নাই। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুর আচারের প্রতি এই অবিচলিত

নিষ্ঠাকে রক্ষণশীলতা বলিয়া নিন্দা করিতে পারি না, বরং ইহাকে চারিত্র বলিয়া নিঃসঙ্কোচে অভিনন্দিত করিতে পারি।

সাত্ত্বিকতা এবং রাজসিকতার অপূর্ব সংমিশ্রণ তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁহার দেহ-মনকে এবং প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া একটি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ও একটি রাজসিক ক্ষত্রিয় একাত্মা হইয়া বাস করিতেছে। অমরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি, বাচন ও আচার-ব্যবহার সাত্ত্বিকতার দ্যোতক; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে একটি বীর্যবান, নির্ভীক ও যুযুধান ক্ষত্রিয় অধিষ্ঠান করিতেছে, উহার সন্ধান জানিতেন একমাত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ সতীর্থ ও সহকর্মিগণ।

অমর-দার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রার দিবসে। এই পরিচয়ের পূর্ব হইতেই আমি জানিতাম অমরেন্দ্রনাথ কে ও কি। খরিদ্দার হিসাবে শ্রমজীবী সমবায়ে আমার যাতায়াতও ছিল। তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিলেও ইতঃপূর্বে কোনো সুযোগ মিলে নাই। এই পরিচয় পরে অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতায় পরিণতি লাভ করে। রাজনীতিক জীবনে একই আদর্শকে আশ্রয় করিয়া এবং একই তীর্থের সহযাত্রী হইয়া উত্তরকালে আমাদের মধ্যে যে সৌভ্রাত্র গড়িয়া উঠে, তাহা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর বন্যায় অমরেন্দ্রনাথ ও শহীদ যতীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে বর্ধমানের বন্যা-বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চলে স্বয়ং-সেবকরূপে সেবা-কার্য করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। কিরূপ মমত্ববোধ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত ইঁহারা স্বদেশের আর্ত নরনারীর সেবা করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি! ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে অমর-দা কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী আছেন। ভগবৎ-করুণায় ও তাঁহার প্রিয় দেশবাসীর মঙ্গলেচ্ছায় তিনি এখন আরোগ্যের পথে।

চৌদ্দ

অমর-দা অসুস্থ হইয়া পড়ায় প্রায় মাস সাতেক পূর্বে তাঁহাকে একখানি চিঠিতে অনুরোধ জানাই,—তিনি যেন শ্রীঅরবিন্দের বাংলা ত্যাগের কাহিনীটা আমাকে লিখিয়া পাঠান। এই সম্পর্কে আমার পরিকল্পিত প্রবন্ধে তাঁহার লিখিত বিবরণ সংযুক্ত করিয়া দিব বলিয়াও পাঠাইলাম। পত্রোত্তরে তিনি উত্তরপাড়া হইতে ২৫।৪।৪৮ তারিখে আমাকে সেই বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন। চিঠিখানিতে প্রসঙ্গ-ক্রমে আরো দুই-একটি বিষয়েরও আলোচনা ছিল। আমি শুধু শ্রীঅরবিন্দের বাংলা ছাড়িয়া পণ্ডিচেরী যাত্রা সম্পর্কিত পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"প্রিয় নগেন, তুমি স্মরণ করে আমায় যে পত্র লিখেছ তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ।...

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা পরিত্যাগের গল্পটা তুমি লিখতে বলেছ। তখন শ্রীঅরবিন্দ আমাদের 'সেজদা', শ্রী তখনও নামে যুক্ত হয়নি। মতিলাল রায়ের প্রবর্তক তখনও ঠিক ধর্মসংঘ হয়নি। আমার কাছে মতিলাল সংবাদ পাঠালে যে, তারা একখানি নৌকা করে শ্রীঅরবিন্দকে আগড়পাড়ায় ডুমুরতলার ঘাটে আনবে ; আমি একখানি উত্তরপাড়ার নৌকা নিয়ে তাঁকে সেই নৌকা করে আগড়পাড়া থেকে 'ডুপ্লেতে' তুলে নিয়ে আসব। আমার স্মরণশক্তি বড় দুর্বল—আর একথা স্মরণ রাখতে হবে ভেবে কাজে নামিনি, কারণ মনে করতাম যে, ফাঁসি বা বুলেটে মৃত্যু ত ঘটবেই একদিন না একদিন। শ্রীঅরবিন্দের যাত্রার তারিখ আমার স্মরণ নাই। তোমরা অনুসন্ধান করে লিখে দিয়ো।

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা ত্যাগের সঙ্গে রামচন্দ্রের কোন সংস্পর্শ ছিল না—কারণ যেদিন তিনি যাত্রা করলেন, কাহাকেও সে দিনটি জান্‌তে দেওয়া হয় নাই। বিজয় নাগ, সুকুমার মিত্র জান্‌ত ; কারণ বিজয় নাগ বোধ হয় তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল বা যাবার প্রস্তাব ছিল।

উত্তরপাড়ার মধ্যে ৺রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মিছ্রিবাবু) জানতেন, আমি জানতাম, আর আমার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ মন্মথনাথ বিশ্বাস জানত। আমরা তাঁকে নৌকা করে গঙ্গার ওপারে 'ডুপ্লের' নিকট উপনীত হবার পর একটা কাণ্ড হল যে, সেখানে যাদের থাকবার কথা ছিল তাদের কারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না—পাসপোর্টটা তাদের কাছে। ডাক্তার আবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে চলে গেছেন। কাজেই আমরা একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁকে পর্দানশীন করে দ্বার রুদ্ধ করে গেলাম হ্যারিসন রোড ধরে; ৬নং কলেজ স্কোয়ারে গাড়ী যায় নাই। চাঁদপাল ঘাট থেকে তাঁকে কলকাতা শহরে ঐ প্রকারে নিয়ে যেতে, আমাদের উদ্বেগ হয়েছিল। কিন্তু যাঁর জন্যে উদ্বেগ, তিনি একেবারেই নিরুদ্বেগে ছিলেন—যেন একটি সমাধিস্থ মূর্তি!

মন্মথকে পাঠালাম কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাটীতে সুকুমার মিত্রকে খুঁজ্তে। তখন বাটীতে কেহই ছিল না—বোঝা গেল যে, তারা আমাদের সন্ধানেই বেরিয়েছে। মন্মথকে পাঠান হ'ল ঘাটের দিকে খুঁজ্তে। আমরা সটাং গেলাম পাসপোর্ট এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের কাছে। তখন রাত্রি ৯টা ৯৷টা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ নেমে গেলেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট সহ এলেন। ডাক্তার লোক ভাল, বিশেষ কোন প্রশ্ন না ক'রে ফিজ্ নিয়ে লিখে দিলেন;—শুধু বলেছিলেন, মনে হচ্ছে তোমার শিক্ষা ইয়োরোপেই হয়েছে।

তারপর গাড়ীখানা ঘাটে এসে থামলো এবং যাদের সঙ্গে মিলনের অভাবে এতটা কাণ্ড করতে হ'ল, তাদের সঙ্গে মিলন হ'ল।

তখন তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন, আর আমি আর একজনের সঙ্গে গেলাম;—সে একজন কে আমার স্মরণ নাই—তুমিই মনে হচ্ছে ছিলে। কেবিনে গিয়ে দেখলাম মনে হচ্ছে বিজয় নাগই বসে আছে। ওঁকে কেবিনে বসিয়ে দুঃখিতান্তঃকরণে ফিরলাম বাড়ীতে—

পকেটে টাকা ছিল—শ্রীঅরবিন্দের হাতে তা দিয়ে নমস্কার করে বিদায় নিলাম। আমার মনে হচ্ছে আমার এক বন্ধু ক্ষীরোদ গাঙ্গুলীও ছিল; আমরা তিনজন উত্তরপাড়ায় ফিরি রাত্রি ১২টায়। যে টাকাটা দিয়েছিলাম সেটা কত ছিল মনে নাই—মিছ্‌রিবাবু তাঁর শেষ প্রণামী দিয়েছিলেন।

তখন ত জানতাম না যে, শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী গিয়ে একেবারে যোগে সমাধিস্থ হবেন—তা'হলে কি সঙ্গ ছাড়তাম, না তাঁকে যেতে দিতাম। এইখানে বছর ছয় খাটিয়ে বাংলার নেতৃত্ব রক্ষা করতাম। তারপর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আমি দুই বার সাক্ষাৎ করি;—একবার অভাবনীয় অবস্থায়,—আর একবার তার পরে। আমাদের বন্ধু সৌম্যদর্শন মতিলাল রায় আর শ্রীঅরবিন্দ উভয়ে সংঘ সৃষ্টি করেছেন;—নানা ব্যাপারে বহুজনবিশ্রুত সাধক যোগী বলে প্রখ্যাত হয়েছেন;—নানা প্রকার বিভূতির কথা আমরা শুনতে পাই;—কিন্তু কি জানি আমি যেন তাঁদের সেই পুরাতন রূপই দেখতে পাই! তাঁদের পরিবর্তন হয়েছে, আমার ত হয়নি;—কাজেই আমি এখনও তাঁদের মধ্যেই আছি ভেবে ভবিষ্যতের আশা পোষণ করি। দিন গুনছি, কবে আমাদের 'সেজদা' ফিরে বাংলায় তাঁর সোনার কাঠির ভৌতিক শক্তিতে ভাঙ্গা বাংলা জুড়ে দেবেন,—কবে আবার সমস্ত দেশ বাংলার নেতৃত্বে নূতন দৃষ্টি লাভ করবে।"......

পনর

অমর-দার লিখিত বিবরণ মোটামুটি ঠিকই বলা যায়। কিন্তু কোন কোন স্থলে মোটা ভুল রহিয়া গিয়াছে। যে স্থলে ভুল আছে এবং উল্লেখযোগ্য কথা বাদ পড়িয়াছে, তাহা আমার পরবর্তী বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে। এখানে একটি কথা বলিয়া নেওয়া ভাল। এই প্রবন্ধে বস্তুতঃপক্ষে আমাদের তিন জনের স্মৃতি-কথা

সম্বলিত হইয়াছে,—অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্থকুমার মিত্র এবং লেখকের। প্রবন্ধ লিখিবার পূর্বে স্থকুমার-দার সঙ্গে আলোচনান্তে প্রয়োজনীয় কথাগুলির সারাংশ টুকিয়া নিয়াছি। তবু পাঠক-পাঠিকার নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি একটি কথা ; —যে-কাহিনী লিখিতেছি তাহা চল্লিশ বৎসর পূর্বের ; স্থতরাং এরূপ ক্ষেত্রে স্মৃতি-বিভ্রম এবং তজ্জনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। স্মৃতি-পথে দীর্ঘকালের ব্যবধান সত্ত্বেও কাহিনীটিকে নির্ভুল করিতে চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। শ্রীঅরবিন্দকে কলিকাতায় জাহাজে উঠাইয়া দিয়া পণ্ডিচেরী রওনা করাইবার ব্যাপারে যে অল্প কয়েক জন সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জীবিত আছি আমরা এই তিন জনই।

এখন আবার মূল কাহিনীতে ফিরিয়া আসিতেছি। গঙ্গার পরপারে নির্দিষ্ট ঘাটে শ্রীঅরবিন্দের নৌকা দেখিতে না পাইয়া আমরা আবার নদী পাড়ি দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। সোজাস্থজি গিয়া উঠি স্থকুমার-দার বাড়ীতে এবং তাঁহাকে এই কথা জানাই। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে চাঁদপাল ঘাটে যাইয়া জাহাজের ক্যাবিন হইতে ট্রাঙ্ক দুইটা উঠাইয়া আনিয়া রাখিতে বলিলেন। স্থরেনবাবু চলিয়া গেলেন মেসের দিকে ; তাঁহার কাজ ওইখানেই শেষ হইয়া গেল।

তখন অপরাহ্ণ প্রায় ছয়টা। ছুটিলাম আবার চাঁদপাল ঘাটের দিকে। সেদিন আমার ছুটাছুটি আর দৌড়াদৌড়ির অন্ত ছিল না। ওই কাজটায় জীবনে আমি কোন দিনই ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করি নাই। আজ বার্ধক্যে অপটু শরীরেও ওই কাজ করিতে আমার মন যায়, কিন্তু শক্তিতে কুলায় না!

জাহাজে গিয়া শুনিলাম, জাহাজের ডাক্তার আসিয়া যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। খবরটা শুনিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গেল। ভাবিলাম এত পরিশ্রমের পরও আমাদের সমস্ত

চেষ্টা বুঝি-বা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে! জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে দেখা করিয়া ঠিকানা জানিয়া নিলাম। ডাক্তারটি ছিলেন ইয়োরোপিয়ান্‌। আমাদের যাত্রী দুইজনকে সেই রাত্রিতেই ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে গিয়া যথারীতি ফিজ্‌ দিয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট আনিতে হইবে। রাত্রি দশটা-এগারটার মধ্যে সার্টিফিকেট আনিয়া জাহাজে উঠা চাই; নতুবা ভোরের জাহাজে আর যাওয়া হইবে না।

যে কুলিটাকে দিয়া জাহাজের ক্যাবিন হইতে ট্রাঙ্ক দুইটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইলাম, সে আমাকে বলিল যে, ডাক্তার সাহেবের বাড়ী সে চিনে এবং সাহেবের বেয়ারার সঙ্গেও তাহার খুব জানা-শুনা আছে, সব কিছু সে ঠিক করিয়া দিতে পারে। তাহাকে আর বেয়ারাকে যে বক্‌শিশ দিয়া খুশী করিতে হইবে, সেই দাবীও সঙ্গে-সঙ্গে জানাইয়া দিল। কুলিটা ছিল বাঙ্গালী, খাস কলিকাতার লোক, বেশ চতুর। তাহার বোলচালে আমার ধারণা হইল, এ কাজ সে করাইয়া দিতে পারিবে। চলিতে-চলিতে হঠাৎ পথ হারাইয়া ফেলিয়া আবার হারানো পথের সন্ধান পাইলে পথচারীর মনে যে অবস্থা হয়, আমারও তাহাই হইল। তবু দুশ্চিন্তার মেঘ একেবারে কাটিয়া যায় নাই; কেননা জাহাজের যাত্রী দুইজনকে লইয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে যে লুকোচুরি খেলার সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার শেষ যে কখন এবং কোথায় হইবে তাহা তখনও বুঝিবার জো ছিল না।

কুলীর কথায় আশ্বস্ত হইলাম এবং তলেতলে খুশীও হইলাম। কিন্তু সে-ভাব গোপন রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—পার্‌বি ত রে ঠিক?—বল্‌ছি বাবু পার্‌ব, মা-কালীর দিব্যি—বলিয়াই সে দুই কানে হাত দিয়া কহিল,—না পার্‌লে দুই কান কেটে দিও বাবু।

—কি পেলে খুশী হবি বল্‌?

—তুমিই বলনা বাবু।

—খুশী হবি তুই, আমি কি করে জানব ?

কুলী তৎক্ষণাৎ আমার সামনে দুই করতল মেলিয়া ধরিয়া ফাঁক-করা দশটি আঙ্গুল দেখাইল এবং আমার চোখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল। বুঝিলাম—সে লক্ষ্য করিতেছিল, আমি টোপ গিলি কিনা। আমার কাজ এবং প্রয়োজনের তুলনায় কুলীর দাবী বেশী মনে হইল না। তাহার দাবী পূরণের জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই রহিলাম। মনের সেই ভাব তাহাকে বুঝিতে দিব না স্থির করিয়া কহিলাম, বড্ড বেশী চেয়েছিস্, যা' আদ্ধেক পাবি।

—না বাবু, পোষাবে না, মাইরি বল্‌ছি, সর্দ্দারকে আবার বখ্‌রা দিতে হবে।—বলিয়াই আমার পা ছুঁইয়া নমস্কার করিয়া জোড়-হাতে নিশ্চল পাষাণ-মূর্তির মত অপেক্ষা করিতেছিল আমার সম্মতির জন্য।

নিরক্ষর কুলী হইলেও এরূপ দর কষাকষির কাজে ইহাদের কাছে শিক্ষিত লোকদেরই হার মানিতে হয়। চতুর অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী যেমন দরদস্তুর করার কালে গ্রাহকের মুখের একটি কথা শুনিয়াই কিংবা তাহার হাবভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারে, ইহাকে টোপ গিলাইতে পারিবে কিনা, কুলীরাও ঠিক তেমনই। দাবীর অর্দ্ধেক সঙ্গে-সঙ্গে মানিয়া নিতেই এবং হাবভাবে সে বুঝিয়া নিল যে, আমি টোপ গিলিয়াছি। মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার কাছে আমার হার মানিতে হইল। টোপ-গেলা মাছও যে বড়শির সূতা ছিঁড়িয়া পালায়, ইহা সম্ভবত কুলীটার ভাল করিয়াই জানা ছিল। সেই জন্যই ভক্তের ন্যায় পদবন্দনা এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান।

শেষ পর্যন্ত ভক্ত প্রার্থিত বর লাভ করিল। আমি মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিলেও আমার মৌন-ভাবকে সে সম্মতির লক্ষণ বলিয়া ঠিকই বুঝিয়া নিয়াছিল। বেয়ারার বক্‌শিশ পাঁচ টাকা ঠিক হইল।

তবে সর্ত ছিল, সেই পাঁচ টাকা কুলীর হাতেই দিতে হইবে; নতুবা বেয়ারা নাকি বেশী টাকা দাবী করিয়া বসিতে পারে। বুঝিলাম, কুলী উহাতে ভাগ বসাইবে।

এই বর্ণনা পড়িয়া পাঠক-পাঠিকারা মনে করিবেন না যে, কুলীর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া করিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। আমাদের নিষ্পত্তি হইয়া গেল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। তাঁহারা ইহাও যেন মনে না করেন যে, আমার সহিত কুলীর যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা আমি হুবহু পুনরাবৃত্তি করিতে পারিয়াছি। কিন্তু ওই রকমের কথাবার্তাই যে হইয়াছিল, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। আর কুলীটার হাবভাব ও আচরণের যে চিত্র আঁকিয়াছি, তাহা বাস্তব। চাঁদপাল ঘাটের সংলগ্ন যে রাজপথের উপর দাঁড়াইয়া আমাতে আর কুলীতে কথাবার্তা হইয়াছিল, উহারই অতি নিকটে ইডেন উদ্যানে আমার বর্তমান অস্থায়ী বাস-ভবনে বসিয়া চল্লিশ বৎসর পরে সেই কাহিনী লিখিতেছি। সেই বলিষ্ঠ-গঠন কৃষ্ণকায় অনতি-দীর্ঘ মধ্যবয়স্ক কুলীর চেহারা আজও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে। মনে হয় যেন, সে-দিনের ওই বাঙ্গালী শ্রমিক, আর সুস্থ সবল শক্তিমান বিংশতিবর্ষীয় তরুণ আমি—রাজপথে তেমনই মুখোমুখি দাঁড়াইয়া।

ষোল

ট্রাঙ্ক দুইটা লইয়া যখন মেসে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুলীটাকে ঘাটে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আসিয়াছি। ছুটিলাম আবার সুকুমার-দার বাড়ীর দিকে। আমার মেস আর 'সঞ্জীবনী' কার্যালয় খুব বেশী হইলেও ৮।১০ মিনিটের পথ। বাহিরের ঘরে তিনি আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। জাহাজের ক্যাবিন হইতে মাল উঠাইয়া আনার

খবর তাঁহাকে জানাইলাম। আনুষঙ্গিক অন্যান্য সংবাদ বলিবার পূর্বেই তিনি নির্দেশ দিলেন,—তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ক দুইটা ও টিকেট দুইখানি লইয়া আবার জাহাজ-ঘাটে চলিয়া যাইতে। সেখানে অমরবাবু শ্রীঅরবিন্দ ও বিজয় নাগকে গাড়ীতে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। জাহাজের ডাক্তার যে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সে খবরও তিনি অমর-দার প্রেরিত লোকের কাছে ইতোমধ্যেই শুনিয়াছেন। ডাক্তারকে দিয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট আনিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা জানাইয়া প্রয়োজনীয় টাকা চাহিতেই তিনি বাড়ীর ভিতরে গিয়া টাকা আনিয়া দিলেন।

মনে হইল, 'পলাতক' শ্রীঅরবিন্দের সন্ধানে তৎপর বাংলার গোয়েন্দা-পুলিস-বাহিনীর সদা-সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরী পাঠাইয়া দিবার যে গোপন অভিযান, তাহা পরিচালনা করিতেছেন সুকুমার-দা। 'সঞ্জীবনী' কার্যালয় হইল অধিনায়কের শিবির। সেখানে বসিয়া তিনি হুকুম দিতেছেন, আমরা নিয়মী আজ্ঞাবহ বিশ্বস্ত সৈনিকের মত তাহা নির্বিচারে তামিল করিয়া যাইতেছি।

মেস্ হইতে ট্রাঙ্ক দুইটা একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া টিকেট দুইখানি সঙ্গে করিয়া ছুটিলাম আবার চাঁদপাল ঘাটের দিকে। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিতে পাই রাস্তার পার্শ্বে শ্রীঅরবিন্দের গাড়ী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেই কুলীটা নিকটেই বসিয়া আছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—'তোমার বাবুরা এসে গেছে। আমি তোমার কথা ব'লে রেখে দিয়েছি। রাত হয়ে গেল, আর দেরী হ'লে কিন্তু সাহেবকে পাওয়া যাবে না, ঘুমিয়ে পড়বে।'

এইখানে অমর-দার বিবরণের মোটা ভুলগুলি দেখাইয়া দেওয়া

আবশ্যক। অমর-দা যে পাস্‌পোর্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভুল। কেন না তৎকালে কলোম্বো-গামী জাহাজের যাত্রীরা বিনা পাস্‌পোর্টেই যাতায়াত করিতে পারিতেন। তবে এখনকার কথা বলিতে পারি না। জাহাজের টিকেটে আর পাস্‌পোর্টে তিনি গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। তারপর আমাকে এবং বিজয় নাগকে ফেলিয়া শ্রীঅরবিন্দকে নিয়া ডাক্তারের বাড়ী যাওয়া এবং সেখান হইতে ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বিবরণ ঠিক নহে। কারণ, আমার কাছে ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট দুইখানা; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনিবার কালে যাত্রীর নাম ও ঠিকানা দিতে হইয়াছিল এবং ক্যাবিনের আসন সংরক্ষিত (Reserved) হইয়াছে সেই নামে। যাত্রী টিকেট দেখাইয়া নাম-ঠিকানা না দিলে ডাক্তারই বা স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিতে যাইবেন কেন? আর বিজয় নাগ ত শ্রীঅরবিন্দের সহযাত্রী; তিনি ডাক্তারের নিকট স্বয়ং উপস্থিত না হইলে তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইবে কি করিয়া এবং সার্টিফিকেটই বা পাইবেন কি ভাবে?

এই স্থলে প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, সুকুমার-দা টিকেট কিনিবার জন্য যে দুইটি নাম-ঠিকানা আমাকে দিয়াছিলেন, তাহা তিনি বাছিয়া নিয়াছিলেন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার গ্রাহক-তালিকা হইতে। একজন ছিলেন রংপুর জিলার গ্রাহক, আর একজন ছিলেন আসামের লখীমপুর জিলার গ্রাহক। শ্রীঅরবিন্দ চলিয়া যাওয়ার পরে ইহা সুকুমার-দার নিকট শুনিয়াছি। কল্পিত নাম-ঠিকানা না দিয়া দুই ব্যক্তির প্রকৃত নাম-ঠিকানা তিনি দিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে, যেন তদন্ত-কালে পুলিসকে গোলক-ধাঁধায় পড়িতে হয় এবং রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে বিলম্ব ঘটে।

আমার গাড়ীখানা বিদায় দিলাম। কুলী ট্রাঙ্ক দুইটা শ্রীঅরবিন্দের গাড়ীর ছাদে অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে রাখিয়া দিল। গাড়ীখানা ছিল দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর। ওই শ্রেণীর গাড়ীগুলির

গড়ন পালকির মত বলিয়া জানালা বন্ধ করিলে বাহির হইতে ভিতরের আরোহীকে চেনা যায় না। সেই জন্যই প্রথম শ্রেণীর ফিটন-গাড়ী ভাড়া করা হয় নাই। আমি গাড়ীতে উঠিয়া অমর-দার পাশে বসিলাম। আমাদের দুই জনের আসন ছিল সামনের দিকে, আর শ্রীঅরবিন্দ ও বিজয় নাগ বসিয়াছিলেন পিছনের দিকে। কুলীটা উঠিয়া বসিল কোচমানের পাশে। ডাক্তারের বাড়ী ছিল যে রাস্তার সঙ্গে, উহার নাম মনে পড়িতেছে না; তবে চৌরঙ্গীর ও-দিকে সাহেব-পাড়ায়, এইটুকু মাত্র স্মরণ আছে।

ডাক্তারের বাড়ী পৌঁছিয়া আমরা চারি জন বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলাম। কুলীটাই বেয়ারাকে ডাকিয়া লইয়া সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিল। সাহেব, শ্রীঅরবিন্দ ও বিজয় নাগকে ডাকিয়া পাঠাইবার পূর্বেই আমি তাঁহাদের টিকেট দুইখানা দিলাম এবং কি নাম-ঠিকানা দিয়া টিকেট করা হইয়াছে তাহাও বলিলাম। ডাক্তারের ফিজ্-এর টাকা শ্রীঅরবিন্দের হাতে দিয়াছিলাম বলিয়াই মনে পড়ে। কত টাকা ফিজ্ দিতে হইয়াছিল, তাহা ঠিক স্মরণ নাই, সম্ভবত বত্রিশ টাকা।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সুকুমার-দার মুখে শুনিয়াছি শ্রীঅরবিন্দ স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি ম্যালেরিয়া-রোগীর ভেক ধরিয়া জাহাজে উঠিবেন এবং চিকিৎসকের উপদেশ মত স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সমুদ্রযাত্রায় যাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিবেন। জাহাজের ক্যাপটেনকেও সুকুমার-দার নির্দেশ মতে আমি জানাইয়াছিলাম, যাত্রী একজন ম্যালেরিয়া-রোগী, নৌকাতে আসিয়া জাহাজে উঠিবেন। পরীক্ষার সার্টিফিকেট লইবার কালে ডাক্তারের প্রশ্নোত্তরে শ্রীঅরবিন্দ অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া বিজয় নাগের মুখে শুনিয়াছি।

শ্রীঅরবিন্দ ও বিজয় নাগকে ডাক্তার ভিতরে ডাকাইয়া নিবার পূর্বে আমাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল প্রায়

আধ ঘণ্টা কাল। ইতোমধ্যে কুলীটা যে একটা মজার কাণ্ড করিয়া বসিল, তাহা আমরা সকলেই উপভোগ করিলাম। কুলীটা আমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিতেছিল,—তোমার ওই বড় বাবুটা ভয় পেল নাকি? সাহেব-সুবার কাছে আর যায় নি বুঝি? ব'লে দেও না, সাহেব ভাল লোক, কিছু ভয় নেই। কুলী আমাদের তিন জনকে মাঝে-মাঝে কথাবার্তা বলিতে দেখিয়াছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে একেবারে চুপচাপ দেখিয়াই সম্ভবত তাহার ওইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। আমি বলিলাম,—না রে, ভয় পাবে কেন? ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগ্‌ছে কিনা, শরীর খারাপ; তাই ওরকম দেখছিস্‌। কুলী আমার কথায় বুঝ পাইল না। চোখের পলকে শ্রীঅরবিন্দের সামনে যাইয়া আস্তে আস্তে বলিল,— 'ভয় পাচ্ছ কেন বাবু? সাহেব বড় ভাল লোক। কিছু তোমার ভয় নেই।' বলিয়াই দৃঢ়-মুষ্টিতে তাঁহার দুই বাহু চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিল, যেন তাঁহাকে সজাগ ও সচেতন করিয়া তুলিতেছে। আমরা তিন জনই পরস্পরের প্রতি চাওয়া-চাওয়ি করিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিলাম, অরবিন্দও মৃদু হাসিলেন। চলচ্চিত্রের মত সে-দৃশ্য আজও আমার মানস-পটে প্রতিফলিত হইতেছে।

ইহার খানিক ক্ষণ পরেই বেয়ারা আসিয়া জানাইল—'সাহেব সেলাম দিয়া।' শ্রীঅরবিন্দ ও বিজয় নাগ বেয়ারার সঙ্গে যাইয়া সাহেবের ঘরে ঢুকিলেন। দশ-পনর মিনিট পরেই তাঁহারা সার্টিফিকেট লইয়া বাহির হইয়া আসেন। বিজয় নাগের কাছে শুনিলাম, কয়েক মিনিটের আলাপেই সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা হইয়াছে ইংলণ্ডে। তাঁহাকে সাহেব এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি সম্মতি-সূচক উত্তর দিলেন।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী ছুটিল আবার সেই চাঁদপাল ঘাটের দিকে। শ্রীঅরবিন্দের চোখে-মুখে চিন্তা-উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই নাই। ইহা

নিয়া পরে আমাদের মধ্যে কথাও হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, শ্রীঅরবিন্দের জন্য আমাদের চিন্তা-উদ্বেগের অন্ত ছিল না। অমর-দা সত্যই বলিয়াছেন—'যাঁর জন্য উদ্বেগ, তিনি একেবারে নিরুদ্বেগেই ছিলেন—যেন একটি সমাধিস্থ মূর্তি!' সেদিনকার শ্রীঅরবিন্দের যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তব ও নিখুঁত। শ্রীঅরবিন্দ যে চিন্তা-উদ্বেগ ও ভয়-ভাবনার অতীত পুরুষ, তিনি যে অভী—তাহা জানিতাম। কিন্তু ইতঃপূর্বে ইহা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই।

গাড়ী চাঁদপাল-ঘাটে আসিয়া যখন পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। জিনিস-পত্র কুলীর মাথায় দিয়া আমরা চার জন 'ডুপ্লেক্স্' (Dupleix) জাহাজে উঠিয়া সংরক্ষিত (Reserved) ক্যাবিনটিতে প্রবেশ করিলাম। কুলী জিনিস-পত্র গুছাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। বিজয় নাগ শ্রীঅরবিন্দের জন্য বিছানা করিতেছেন। অমর-দা আর আমি দোর-গোড়ায় শ্রীঅরবিন্দের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া। অমর-দা জামার পকেট হইতে কতগুলি ভাঁজ-করা নোট লইয়া মিছ্রি বাবুর নাম করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি নোটগুলি নিলেন নিঃশব্দে হাত পাতিয়া; তারপর অমর-দা নতশিরে জোড়হাত কপালে ছোঁয়াইয়া শ্রীঅরবিন্দকে নমস্কার করেন। আনত ললাট শ্রীঅরবিন্দ-পদে রাখিয়া আমি প্রণতি নিবেদন করিলাম, কৃতার্থ হইলাম দেব-দেহ স্পর্শে।

বিজয়া-দশমী দিন প্রতিমা বিসর্জনান্তে গৃহে ফিরিবার সময় মন যেমন অবসাদে আছন্ন হইয়া পড়ে, গঙ্গা-বক্ষে ভাসমান জাহাজে দেবতা-বিদায়ের পর আমিও তেমনই অবসন্ন-মনে বাড়ী ফিরিলাম। জীবনের প্রভাত-কালে একদা যে দেবতাকে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি হইতে বিদায় দিয়াছিলাম, আজ জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় সেই দেবতারই পুনরাগমন কামনা করিতেছি। মা আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে কি?

———

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী

এক

শ্রীঅরবিন্দ বাঙালী। বাংলা দেশের কোলেই তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। তাঁহার জনক-জননী বাঙালী। বাংলার মাটিতে খেলাধূলার মধ্যে দিয়া তাঁহার শৈশবের ছয়টি বৎসর কাটিয়া গেল। সাত বৎসরের বালককে পাঠানো হইল সুদূর ইংলণ্ডে শিক্ষা-লাভের জন্য। বঙ্গ-জননীর ছায়া-সুনিবিড় আশ্রয় ছাড়িয়া, বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল বাস করিতে হইল বিদেশে ইংরেজ সমাজের মণ্ডলে—ইংরেজ পরিবারের মধ্যে। সেইখানেই তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের চতুর্দশ বৎসর অতীত হইয়া যায়।

পরদেশী বিদ্যার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া, বিদেশীজ্ঞানের সমুদ্র মন্থন করিয়া শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন তিনি আর মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলিত পারেন না। বাক্যে তিনি বাঙালী না হইলেও কায়-মনে তখনও তিনি বাঙালীই রহিয়াছেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, প্রকৃত বাঙালী হইতে হইলে তাঁহাকে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে এবং বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই তিনি বাংলা ও বাঙালীকে ভাল করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চিনিতে ও বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু দেশে ফিরিয়াও তাঁহাকে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিতে হইল বাংলার বাহিরে—বরোদা রাজ্যে। নানা অসুবিধা ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও বাণীর বরপুত্র শ্রীঅরবিন্দ মাতৃভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বাংলা ভাষায় একজন সুলেখক হইয়াছিলেন এবং একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনও করিয়াছিলেন। তাঁহার 'কারাকাহিনী' বাংলা ভাষায় রচিত হইয়া 'সুপ্রভাত'

মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে 'কারাকাহিনী' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। তাঁহার সম্পাদিত 'ধর্ম' পত্রিকার সুলিখিত সুচিন্তিত ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী 'ধর্ম ও জাতীয়তা' নামক গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। 'জগন্নাথের রথ'ও মাতৃভাষায় তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধের সমষ্টি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ জনসভায় বাংলায় বক্তৃতা দিতে পারিতেন না। এইজন্য তিনি প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাংলা ও বাঙালীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-বাৎসল্যের গোমুখী' ছিল বাংলা ও বাঙালী। দেশনায়ক শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে, কবি-মনীষী শ্রীঅরবিন্দের মানসে, ঋষি শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে বাংলা ও বাঙালী কোন্ রূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল, এই প্রবন্ধে সেই আলোচনা করিতে চেষ্টিত হইব।

দুই

বাঙালীর শক্তিতে শ্রীঅরবিন্দের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা দেশের মাটিতেই ভরতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনার উপযোগী প্রচুর মালমসলা রহিয়াছে; এবং বাঙালী জাতির মধ্য হইতেই গড়িয়া উঠবে ভাবী কালের মুক্তি-অভিযানের দুর্ধর্ষ মৃত্যুঞ্জয়ী সেনা ও সেনানী। সেই জন্যই তিনি বাংলার উর্বর মাটিতে প্রথম বিপ্লবের বীজ রোপণ করেন। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। তখনকার দিনে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজের ন্যায় শক্তিশালী জাতির রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা সম্ভবপর বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। দেশের অধিকাংশ লোকই ইঁহাদের বাতুল বলিয়া মনে করিতেন এবং ইঁহাদের কথাকে

পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। শ্রীঅরবিন্দ কি ভাবে বাংলায় প্রথম বিপ্লবের বীজ রোপণ করেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর যুগান্তর-বিপ্লবী-বাহিনীর অধিনায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষের একটি প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

"পুণার যে ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতি থেকে বিপ্লবের বীজ শ্রীঅরবিন্দের দ্বারা বাংলার মাটিতে ১৯০২ সালে রোপিত হ'ল, তারও এক বিস্মৃত অধ্যায় আছে।...

"শ্রীঅরবিন্দ তখন গায়কোবাড় তরুণ সয়াজী রাওয়ের রাজ-অমাত্য, তিনি পুণার গুপ্ত বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত এবং গণতন্ত্রী ভারতের গুজরাট শাখার সভাপতি। কঠোর হস্তে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট চাপেকার সমিতিকে দলন করলেও সে আগুন একেবারে নিভে যায় নাই। অন্তঃসলিলা হয়েছিল মাত্র। যখন বরোদার মহারাজের শরীর রক্ষার কাজে ইস্তফা দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে সরলা দেবীর নামে শ্রীঅরবিন্দের পত্র নিয়ে বাংলায় আসেন, তখন দাক্ষিণাত্যের সে অগ্নি তুষাগ্নির মত অলক্ষ্যে জ্বলছে। যতীনদা ব্যারিষ্টার পি. মিত্রকে কেন্দ্রী ক'রে সুকিয়া স্ট্রীট থানার কাছে ১০২ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে গুপ্ত সমিতির প্রথম কেন্দ্রের পত্তন করলেন ; শ্রীঅরবিন্দের কাছে আমি দীক্ষা নিয়ে এই কেন্দ্রে আসি ১৯০৩ সালের গোড়ায়, যতীনদার বাংলায় আসার ৬ মাস পরে। এই হ'ল বাংলার বিপ্লব বীজ বপনের প্রথম ও আদি সূত্রপাত।...

"আমাদের গুপ্ত সমিতির আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা ১৯০২ সালে ও ১৯০৪ সালে গৃহকলহের ফলেই এ পর্বের পরিসমাপ্তি।"... ("স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকা")।

গৃহ-বিবাদের দরুণ সাময়িক ভাবে গুপ্ত সমিতির কার্য বিঘ্নিত হইলেও ১৯০৫ সালে আগস্ট মাসে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার

পর হইতে পূর্ণোদ্যমে কার্য চলিতে লাগিল। শ্রীঅরবিন্দের রোপিত বীজ নিষ্ফল হয় নাই। দেখিতে দেখিতে বাংলার তরুণেরা বিপ্লবের অগ্নি-মন্ত্রে দলে দলে দীক্ষা লইতে লাগিল। উত্তরকালে বাংলার বিপ্লবীরাই সমগ্র ভারতবর্ষে বিপ্লবের অনল জ্বালাইয়াছিল। কর্ম-ক্ষেত্র ও কর্মীনির্বাচনে তাঁহার দূরদৃষ্টির পরিচয় মিলে। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে নিখিল ভারতের মধ্যে বাংলা সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র এবং বাঙালী সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী। শ্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত বাংলার যুগান্তর বিপ্লবী দল হইতেই আমরা পাইয়াছি ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম শহীদ-চতুষ্টয়—প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন বসু। শত্রু-হস্তে বন্দী হওয়া আসন্ন দেখিয়া প্রফুল্ল পর পর দুইবার নিজের শরীরে রিভল্‌ভারের গুলি ছুঁড়িয়া আত্মহনন করেন এবং প্রথম শহীদের মর্যাদা পান। আর 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়-গান'—তাহাদের মধ্যে ক্ষুদিরাম-কানাই-সত্যেন হইলেন অগ্রদূত।

তিন

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যপর্বে যখন বিদেশী রাজের দমন-নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগ চলিতেছিল, তখন শ্রীঅরবিন্দ বাংলার যুবকদের লাঞ্ছনা-নির্যাতন-ভোগ ও দুঃখ-বরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বাংলার বাহিরে এক জনসভায় তাহাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বাজাতিকতার সদ্যপ্রাপ্ত নব-তত্ত্বের প্রেরণায় বাংলার যুবকগণ উন্মাদনার মুখে ছুটিয়া আসে। তাহারা নবলব্ধ শক্তির আনন্দে আত্মহারা হইয়া দ্রুতবেগে আগাইয়া চলে এবং চলার পথে যাবতীয় বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। ইহাদিগকেই আজ আহ্বান করা হইয়াছে দুঃখ-যাতনা ভোগ করিবার জন্য। তাহারা আহূত হইয়াছে বিজয়ের

মাল্য পরিবার জন্য নহে, দুঃখ-ভোগ কিংবা মৃত্যু-বরণের মধ্যে দিয়া শহীদের মাল্য পরিবার জন্যই। "They were called upon to bear the crown, not of victory but of martyrdom."

বাংলার তৎকালীন রাজনীতিক 'পরিস্থিতি'র বর্ণনা দিয়া এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকার মুদ্রাকরের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও বাংলা দৈনিক 'নবশক্তি' পত্রিকার মুদ্রাকরের গ্রেপ্তারের সদ্য-প্রকাশিত বার্তার উল্লেখ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—ভারতবর্ষে বর্তমান স্বাজাতিকতা বা স্বাদেশিকতা নামে যে একটা ধর্ম আছে, তাহা আপনারা পাইয়াছেন বাংলা হইতে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। এই ধর্ম গ্রহণ করার দায়িত্ব আপনারা উপলব্ধি করিয়াছেন তো? না, কেবল উচ্চস্তরের বিদ্যা-বুদ্ধির গর্ববোধেই আপনারা ইহা গ্রহণ করিয়াছেন? আপনারা তো নিজেকে জাতীয়তাবাদী (ন্যাশন্যালিস্ট) বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। স্বাজাতিকতা বা 'ন্যাশনালিজ্‌ম' বলিতে আপনারা কি বুঝেন? স্বাজাতিকতা একটা রাজনীতিক কার্যক্রম নহে; স্বাজাতিকতা একটা ভগবৎপ্রেরিত ধর্ম; স্বাজাতিকতা একটা ধর্মবিশ্বাস, যাহা আপনারা কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

তিনি ইহাও বলেন যে, যাঁহারা জাতীয়তাবাদী, তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই স্বাজাতিকতা-ধর্ম স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাঁহাদিগকে এ কথা অবশ্যই স্মরণে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা ভগবানের হাতের যন্ত্র মাত্র। বাংলায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কি? তাঁহারা সকলেই তো জাতীয়তাবাদী, কিন্তু বাংলার মত 'পরিস্থিতি'র সম্মুখীন হইলে তাঁহারা কি করিবেন? রাজ-নিগ্রহ যে বাংলায় দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ বাংলা দেশে জনগণের মধ্যে স্বাজাতিকতার

আবির্ভাব হইয়াছে একটা ধর্মরূপে, এবং ইহাকে ধর্ম বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই ধর্মের বিরোধী কতকগুলি গ্রহ ইহার উপচীয়মান শক্তিকে বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন—যখন কোন নব ধর্ম প্রচারিত হয়, তখন সচরাচর এইরূপই ঘটিয়া থাকে; যখন ভগবান্ স্বয়ং জনগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে যাইতেছেন, তখন তো ওই সমুদয় গ্রহ উহাদের যাবতীয় প্রহরণে সজ্জিত হইয়া সেই ধর্মকে বিনাশ করিবার জন্য সজাগ হইয়া উঠিবে। বাংলা দেশেও একটা নূতন ধর্ম, একটা দিব্য ও সাত্ত্বিক ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহারা যত কিছু অস্ত্র-শস্ত্র আছে সেইগুলি লইয়া এই ধর্মকে বিনাশ করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে।

জাতীয়তাবাদী দলের ভারতবরেণ্য নেতা, স্বদেশপ্রেম-ধর্মের প্রচারক, স্বাজাতিকতা-বেদের উদ্‌গাতা শ্রীঅরবিন্দ নবধর্মে দীক্ষিত বাংলার অক্ষয় প্রাণশক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন—বাংলা দেশে কিসের বলে আমরা টিকিয়া আছি? স্বাজাতিকতার বিনাশ হয় নাই—হইবেও না। ঐশী শক্তিতেই স্বাজাতিকতা টিকিয়া থাকিবে এবং যত কিছু অস্ত্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হউক না কেন, ইহার বিনাশ কখনও সম্ভব হইবে না। স্বাজাতিকতা অমর, স্বাজাতিকতার মৃত্যু হইতে পারে না; কারণ ইহা কোন মানবীয় বস্তু নহে, বাংলা দেশে স্বয়ং ভগবান কাজ করিতেছেন। ভগবানকে নিধন করা যাইতে পারে না,—কারাগারে আবদ্ধও করা যাইতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা একদা বাংলা দেশের লোককে অপদার্থ বলিয়াই জানিত। তাহাদের কাছে 'বাঙালী' ছিল একদা নিন্দাসূচক শব্দ। বাংলাকে দিয়াই ভারতের মুক্তি হইবে, এ কথা বলিলে তখন তো কেহই

বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সেই পুরাতন বাংলা ও বাঙালী আর নাই। স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার নবজন্ম হইয়াছে। বাংলা ও বাঙালীর এই পরিবর্তন কি করিয়া সম্ভব হইল? বাংলায় একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে, বাংলা বিশ্বাস করিতে শিখিতেছে। বাঙালী কোন কিছু যদি একবার বিশ্বাসই করে, তবে তাহা আর পরিত্যাগ করে না; বিশ্বাস বাঙালীর প্রাণবায়ু তুল্য। বাঙালী যদি বিশ্বাস করে যে, এই কার্যটি দেশের মুক্তির জন্য আবশ্যক, তবে সে তাহা করিবেই। সে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তাহা পালন করিবার জন্য কোন প্রকার বিপদকেই গ্রাহ্য করিবে না। বাঙালী-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই বাঙালীকে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে। বিশ্বাসের ক্ষমতা বাঙালীর আয়ত্ত। এই ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ভারতের মুক্তির জন্য বাঙালীকেই বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।

চার

শ্রীঅরবিন্দের যে ভাষণ হইতে উদ্ধৃতি দিলাম, তাহা প্রদত্ত হইয়াছিল বোম্বাইয়ে এক জনসভায় ১৯০৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গের পালা শেষ করিয়া তিনি তখন নানা স্থানে জনসভায় স্বাজাতিকতার বাণী প্রচার করিতেছিলেন। সুরাট কংগ্রেসের পর হইতে তিনি জনসভায় যে সকল বক্তৃতা দিতেন, তাহা পূর্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া দিতেন না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার গুরুদেব বিষ্ণু ভাস্কর লেলের উপদেশমতে ভাষণ প্রদানের জন্য এই অভিনব পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন।

এই স্থলে প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতেছি যে, সুরাট কংগ্রেস হইতে প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রকুমারকে সঙ্গে লইয়া বরোদায় যান; এবং তথায় কয়েকদিন এক নির্জন

পুরীতে অবস্থান করিয়া বিষ্ণু ভাস্কর লেলের নিকট যোগ-দীক্ষা লাভ করেন। লেলে যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী মহাযোগী ও মহাসাধক, তাহা বারীন্দ্রকুমার এবং তাঁহার সতীর্থ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা হইতে জানা যায়। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন :

"পুণায় বক্তৃতা-কালে শ্রীঅরবিন্দ লেলের উপদেশে আগে কর্তব্য বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া বক্তৃতা দেওয়া ছাড়িয়া দিলেন। শান্ত হইয়া শূন্য মন নিয়া বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইবামাত্র, আপনি অনর্গল কথার পর কথা কে যেন অন্তরে বসিয়া যোগাইয়া দিত।"

পাঁচ

বাংলার যুবকগণের শক্তির উপর শ্রীঅরবিন্দের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল মানিকতলা বোমার মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের সহিত কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল কারাগারে বাস করিয়া। তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম, ত্যাগ, দুঃখবরণ, উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। আলিপুরের অতিরিক্ত সেস্‌ন জজ মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌টের আদালতে দুইজন এসে-সরের সাহায্যে যে ৩৭ জন আসামীর বিচার হইয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন প্রধান আসামী এবং তিনিই আসামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। তৎকালে তাঁহার বয়সও ছিল মাত্র ৩৫ বৎসর। আসামীদের মধ্যে শচীন্দ্র-কুমার সেন ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ; তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর। দায়রা আদালতের বিচারে ১৯ জন আসামীর প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও যুদ্ধপ্রচেষ্টা, নরহত্যা,

রাজদ্রোহ ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগে তাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা মুক্তি পাইলেন, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদের অন্যতম।

হাইকোর্টে আপীলের শুনানীকালে দণ্ডিত আসামী অশোক নন্দীর মৃত্যু হয়। হাইকোর্টের বিচারে তিন জন মাত্র মুক্তি পাইলেন; এবং বারীন্দ্র ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল। আরও কয়েক জনের দণ্ডও হ্রাস করা হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন ১৯০৮ সনের ২রা মে; এবং তদবধি বিচারাধীন আসামীরূপে কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন ১৯০৯ সনের ৬ই মে। কারামুক্তির পরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার কারাবাসী সহকর্মীগণ সম্বন্ধে আর্য আদর্শ ও গুণত্রয় শীর্ষক একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"আজ পর্যন্ত যাহাকে আমরা আর্যশিক্ষা বলি, তাহা প্রায় সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন। রজোগুণের আদর এই দেশে ক্ষত্রিয় জাতির লোপে লুপ্ত হইয়াছে। অথচ জাতীয় জীবনে রজঃশক্তির নিরতিশয় প্রয়োজন আছে। সেই জন্য গীতার দিকে লোকের মন আজকাল আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষা পুরাতন আর্যশিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে। গীতোক্ত ধর্ম রজোগুণকে ভয় করে না, তাহাতে রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে, প্রবৃত্তি-মার্গে মুক্তির উপায় প্রদর্শিত আছে। এই ধর্ম অনুশীলনের জন্য জাতির মন কিরূপে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জেলেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম; এখনও স্রোত নির্মল হয় নাই, এখনও কলুষিত ও আবিল, কিন্তু অতিরিক্ত বেগ যখন অল্প প্রশমিত হইবে, তখন তাহার মধ্যে যে বিশুদ্ধ শক্তি লুক্কায়িত, তাহার নিখুঁত কার্য হইবে।

"যাঁহারা আমার সঙ্গে বন্দী ও এক অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নির্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, আর

সকলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া দণ্ডিত। মানব-সমাজে হত্যা হইতে গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না। জাতীয় স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যে হত্যা করে, তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র কলুষিত না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সামাজিক হিসাবে অপরাধীর গুরুত্ব লাঘব হইল না। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, হত্যার ছায়া অন্তরাত্মায় পড়িলে মনে যেন রক্তের দাগ বসিয়া থাকে, ক্রূরতার সঞ্চার হয়। ক্রূরতা বর্বরোচিত গুণ, মনুষ্য উন্নতির ক্রমবিকাশে যে সকল গুণ হইতে অল্পে অল্পে বর্জিত হইতেছে, সেই সকলের মধ্যে ক্রূরতা প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারিলে মানবজাতির উন্নতির পথে একটি বিঘ্নকর কণ্টক উন্মূলিত হইয়া যাইবে। আসামীর দোষ ধরিয়া লইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, রজঃশক্তির ক্ষণিক উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। তাঁহাদের মধ্যে এমন সাত্ত্বিক শক্তি নিহিত যে, এই ক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা দেশের অমঙ্গল সাধিত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

"যে কয়দিন আমরা এক সঙ্গে এক বৃহৎ দালানে রক্ষিত ছিলাম, আমি তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দুইজন ভিন্ন কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের ছায়া পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণবয়স্ক, অনেকে অল্পবয়স্ক বালক, যে অপরাধে ধৃত, সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড যেরূপ ভীষণ তাহাতে দৃঢ়মতি পুরুষেরও বিচলিত হইবার কথা। আর ইঁহারা বিচারে খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না। বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষী লেখাসাক্ষ্যের যেরূপ ভীষণ আয়োজন জমিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আইন-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সহজেই ধারণা হয় যে, নির্দোষীরও এই ফাঁদ হইতে নির্গমনের পথ নাই। অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষন্নতার পরিবর্তে কেবল প্রফুল্লতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভুলিয়া ধর্মের ও দেশের কথা।

"...মোকদ্দমায় কেহ মন দিত না, সকলেই ধর্মে বা আনন্দে দিন কাটাইত। এই নিশ্চিন্ত ভাব কঠিন কুক্রিয়াভ্যস্ত হৃদয়ের পক্ষে অসম্ভব; তাঁহাদের মধ্যে কাঠিন্য, ক্রূরতা, কুক্রিয়াশক্তি, কুটিলতা লেশমাত্র ছিল না। কি হাস্য, কি কথা, কি খেলা তাঁহাদের সকলই আনন্দময়, পাপহীন, প্রেমময়।

"...জ্ঞান ও আনন্দ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যাঁহারা দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না, যাঁহারা সকল অবস্থায় আনন্দিত প্রফুল্লিত, তাঁহাদেরই যোগে অধিকার। জেলে রাজসিক ভাব প্রশ্রয় পায় না, আর নির্জন কারাগারে প্রবৃত্তির পরিপোষক কিছুই নাই। এই অবস্থায় অসুরের মন চিরাভ্যস্ত রজঃশক্তির উপকরণের অভাবে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিজেকে নাশ করে। পাশ্চাত্য কবিগণ যাহাকে Eating one's own heart বলেন, সেই অবস্থা ঘটে। ভারতবাসীর মন সেই নির্জনতায়, সেই বাহ্যিক কষ্টের মধ্যে চিরন্তন টানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট ছুটিয়া যায়। আমাদের ইহাই ঘটিয়াছে। জানি না কোথা হইতে একটি স্রোত আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া নিয়া গেল! যে কখনও ভগবানের নাম করে নাই, সেও সাধনা করিতে শিখিল! আর সেই পরম দয়ালুর দয়া অনুভব করিয়া আনন্দময় হইয়া পড়িল! অনেক দিনের অভ্যাসে যোগীর যাহা হয়, এই বালকদের দু' চারি মাসের সাধনায় তাহা হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলিয়াছিলেন,—'এখন তোমরা কি দেখ্‌ছ;—ইহা কিছুই নয়, দেশে এমন স্রোত আস্‌ছে যে, অল্প বয়সের ছেলে তিন দিন সাধনা করে' সিদ্ধি পাবে।' এই বালকদিগকে দেখিলে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না। ইহারা যেন সেই প্রত্যাশিত ধর্মপ্রবাহের মূর্তিমন্ত পূর্বপরিচয়। এই সাত্ত্বিক ভাবের তরঙ্গ কাঠগড়া বহিয়া চার-পাঁচ জন ভিন্ন অন্য সকলের হৃদয় মহানন্দে আপ্লুত করিয়া তুলিত। ইহার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে সে কখনও তাহা ভুলিতে পারে

না এবং কখনও অন্য আনন্দকে ইহার তুল্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। এই সাত্ত্বিক ভাবই দেশের উন্নতির আশা। ভ্রাতৃভাব, আত্মজ্ঞান, ভগবৎপ্রেম যেমন সহজে ভারতবাসীর মনকে অধিকার করিয়া কার্যে প্রকাশ পায়, আর কোনও জাতির তেমন সহজে হওয়া সম্ভব নয়। চাই তমোবর্জন, রজোদমন, সত্ত্বপ্রকাশ। ভারতবর্ষের জন্য ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধিতে তাহাই প্রস্তুত হইতেছে।"

ছয়

শ্রীঅরবিন্দের কারা-সঙ্গীদের মধ্যে একজন মারাঠী যুবক ছিলেন, আর সকলেই ছিলেন বাঙালী। মারাঠী যুবকটির নাম বালকৃষ্ণ হরি কানে। এই উনবিংশবর্ষীয় যুবক সেস্‌ন জজ কর্তৃক সাত বৎসর দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন; কিন্তু হাইকোর্টের আপীলে সে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইয়া যায় এবং তিনি মুক্তি পান।

একাধিক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ এই সকল আদর্শ-চরিত্র ধর্মপ্রাণ ও দেশভক্ত বীর যুবকের প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। আর একটি রচনা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

"...আমার বিপদের সঙ্গী বালক আসামীদের কথা বলি। কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বঙ্গে নূতন যুগ আসিয়াছে, নূতন সন্ততি মায়ের কোলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে কালের বাঙ্গালীর ছেলে দুই প্রকার ছিল; হয় শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ, সচ্চরিত্র, ভীরু, আত্মসম্মান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা-শূন্য, নয় দুশ্চরিত্র, দুর্দান্ত, অস্থির, ঠগ, সংযম ও সততাশূন্য। এই দুই চরমাবস্থার মধ্যস্থলে নানারূপ জীব বঙ্গজননীর ক্রোড়ে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আট দশ জন অসাধারণ প্রতিভাবান শক্তিমান ভবিষ্যৎ কালের পথপ্রদর্শক ভিন্ন এই দুই শ্রেণীর অতীত

তেজস্বী আর্যসন্তান প্রায়ই দেখা যাইত না। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ছিল, মেধাশক্তি ছিল, কিন্তু শক্তি ও মনুষ্যত্ব ছিল না। কিন্তু এই বালকগণকে দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্য কালের অন্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দান্ত তেজস্বী পুরুষসকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক, সরল চাহনি, সেই তেজপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য, এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা, ভাবনা ও সন্তাপের অভাব সেকালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন কর্মস্রোতের লক্ষণ। ইঁহারা যদি হত্যাকারী, তবে বলিতে হয় যে, হত্যার রক্তময় ছায়া তাঁহাদের স্বভাবে পড়ে নাই, ক্রূরতা, উন্মত্ততা, পাশবিক ভাব তাঁহাদের মধ্যে আদবে ছিল না। তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্য লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কারাবাসের দিন বালকের আমোদে, হাস্যে, ক্রীড়ায়, পড়াশুনায়, সমালোচনায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্র জেলের কর্মচারী, সিপাহী, কয়েদী, য়ুরোপীয় সার্জেন্ট, ডিটেক্‌টিভ্, কোর্টের কর্মচারী সকলের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছিলেন এবং শত্রু মিত্র বড় ছোট বিচার না করিয়া সকলের সঙ্গে আমোদ, গল্প ও উপহাস আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ করিয়া তাঁহার তিন জন কারাসঙ্গী সম্পর্কে যে উচ্চ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। এই তিন জন হইলেন—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ধরণীনাথ গুপ্ত এবং তাঁহাদের আত্মীয় অশোকচন্দ্র নন্দী। ইঁহারা অন্যতম প্রধান আসামী উল্লাসকর দত্তেরও আত্মীয়। বোমার মামলার সংস্রবে তিন জনই কলিকাতা ১৩৪নং হ্যারিসন রোডে "ছাত্র ভাণ্ডার" নামক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। খানাতল্লাশীতে তথায় মারাত্মক বোমা, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, অস্ত্রশস্ত্র ও বিপ্লবী দলের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আবিষ্কৃত হয়। মানিকতলা

বোমার মামলার বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বে হাইকোর্টের সেসন্‌স্‌ আদালতে ভারতীয় অস্ত্র-আইনভঙ্গের অভিযোগে তাঁহাদের বিচার হয়। গুপ্ত ভ্রাতৃযুগল সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং অশোক মুক্তি পাইলেন। নগেন্দ্র ও ধরণীর বয়স ছিল যথাক্রমে ২৭ ও ২১ বৎসর, আর অশোকের বয়স ছিল ১৮ বৎসর। অশোক ত্রিপুরা জিলার কালীকচ্ছের বিখ্যাত নন্দী-বংশের সন্তান। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দী একজন আদর্শ দেশভক্ত, সমাজ-সংস্কারক, লোকসেবক ও সাধুপুরুষ বলিয়া খ্যাতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন।

বোমার মামলায় সেসন্‌ জজের বিচারে নগেন্দ্রনাথ ও ধরণীনাথ মুক্তি পাইয়াছিলেন। অশোক সাত বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গুপ্ত ভাতৃদ্বয় সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের লেখা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

"...এখন দুইজন শিক্ষিত যুবকের কথা বলি। ইঁহারা হ্যারিসন রোডের কবিরাজদ্বয় নগেন্দ্রনাথ ও ধরণী। ইঁহারা সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইঁহারা যেরূপ শান্তভাবে, যেরূপ সন্তুষ্ট মনে এই আকস্মিক বিপত্তি, এই অন্যায় রাজদণ্ড সহ্য করিতেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হইত। কখনও তাঁহাদের মুখে ক্রোধ-দুষ্ট বা অসহিষ্ণুতা-প্রকাশক একটিও কথা শুনি নাই। যাঁহাদের দোষে জেলরূপ নরকে যৌবনকাল কাটাইতে হইল, তাঁহাদের প্রতি যে লেশমাত্র ক্রোধ, তিরস্কার ভাব বা বিরক্তি পর্যন্ত আছে, তাহার কোন লক্ষণ কখনও দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার গৌরবস্থল পাশ্চাত্ত্য ভাষায় ও পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যায় অভিজ্ঞতাবঞ্চিত, মাতৃভাষারই ইঁহাদের সম্বল ; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষালব্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য কমই লোক দেখিয়াছি। দু'জনেই মানুষের নিকট আক্ষেপ কিংবা বিধাতার নিকট নালিশ না করিয়া সহাস্যমুখে, নতমস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। দুইটি ভাইই

সাধক, কিন্তু প্রকৃতি বিভিন্ন। নগেন্দ্র ধীরপ্রকৃতি, গম্ভীরবুদ্ধি। হরিকথা ও ধর্মবিষয়ক আলাপ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যখন আমাদিগকে নির্জন কারাবাসে রাখা হইল, তখন জেল কর্তৃপক্ষ জেলের খাটুনি সমাপ্তে আমাদের বই পড়িবার অনুমতি দিলেন। নগেন্দ্র ভগবদ্গীতা পড়িতে চাহিয়া বাইবেল পাইয়াছিলেন। বাইবেল পড়িয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হয়, কাঠগড়ায় বসিয়া আমার নিকট তাহার বর্ণনা করিতেন। নগেন্দ্র গীতা পড়েন নাই, তথাপি আশ্চর্যের সহিত দেখিলাম বাইবেলের কথা না বলিয়া গীতার শ্লোকার্থ বলিতেছেন। এমন কি এক একবার মনে হইত যে, ভগবদ্গুণাত্মক মহৎ উক্তি সকল কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-নিঃসৃত উক্তিগুলি সেই বাসুদেব-মুখপদ্ম হইতে এই আলিপুরে কাঠগড়ায় আবার নিঃসৃত হইতেছে। গীতা না পড়িয়া বাইবেল গীতার সমতাবাদ, কর্মফল ত্যাগ, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করা সামান্য সাধনার লক্ষণ নহে। ধরণী নগেন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান নন, কিন্তু বিনীত ও কোমলপ্রাণ, স্বভাবতঃই ভক্ত। তিনি সর্বদা মাতৃধ্যানে বিভোর, তাঁহার মুখে প্রসন্নতা, সরল হাস্য ও কোমল ভক্তিভাব দেখিয়া জেলের জেলত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িত। ইঁহাদের দেখিলে, কে বলিতে পারে বাঙ্গালী হীন অধম? এই শক্তি, এই মনুষ্যত্ব, এই পবিত্র অগ্নি ভস্মরাশিতে লুক্কায়িত আছে মাত্র।

"ইঁহাদের উভয়েই নিরপরাধ। বিনা দোষে কারাবদ্ধ হইয়াও নিজগুণে বা শিক্ষাবলে বাহ্য সুখদুঃখের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"—('কারাগৃহ ও স্বাধীনতা'—'ভারতী' আষাঢ় ১৩১৬)।

অশোকের প্রসঙ্গ শ্রীঅরবিন্দ "নবজন্ম" শীর্ষক পৃথক একটি প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার কিয়ংদশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"...যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, তাঁহাদের কেহ বিশ্বাস করিতে

পারিতেন না যে, ইনি কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। ইনি অল্প ও অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি অন্য যুবকগণের ন্যায় প্রবল দেশসেবার আকাঙ্ক্ষায় অভিভূত হন নাই। বুদ্ধিতে, চরিত্রে, প্রাণে তিনি সম্পূর্ণ যোগী ও ভক্ত, সংসারীর গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন। তাঁহার পিতাও যোগপ্রাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ। গীতায় যে যোগীকুলে জন্ম মানুষের পক্ষে অতি দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। অল্প বয়সে তাঁহার অন্তর্নিহিত যোগশক্তির লক্ষণ এক একবার প্রকাশ পাইয়াছে। ধৃত হইবার বহু পূর্বে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার যৌবন-কালে মৃত্যু নির্দিষ্ট, অতএব বিদ্যালাভে ও সাংসারিক জীবনে তাঁহার মন বসে নাই; তথাপি পিতামাতার পরামর্শে পূর্বজ্ঞাত অসিদ্ধি উপেক্ষা করিয়া কর্তব্যকর্ম বলিয়া তাহাই করিতেছিলেন এবং যোগ-পথেও আরূঢ় হইয়াছিলেন। এমন সময় তিনি অকস্মাৎ ধৃত হইলেন। এই কর্মফলপ্রাপ্ত বিপদে বিচলিত না হইয়া আলিপুর জেলে যোগাভ্যাসে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই মোকদ্দমায় আসামীদের মধ্যে অনেকে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য না হইয়া অন্যতম ছিলেন। তিনি ভক্তি ও প্রেমে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাঁহার উদার চরিত্র, গভীর ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় সকলের পক্ষে মুগ্ধকর ছিল। গোঁসাইয়ের হত্যার সময়ে ইনি হাসপাতালে রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের পূর্বেই নির্জন কারাবাসে রক্ষিত হইয়া তিনি বার বার জ্বরভোগ করিতে লাগিলেন। সেই জ্বরাবস্থাতেই মুক্ত-কক্ষে হিমে রাত্রিযাপন করিতে হইত। ইহাতে ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থায় যখন প্রাণরক্ষার আর আশা নাই, তখন বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি আবার সেই মৃত্যু আগারে রক্ষিত ছিলেন। ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের

আবেদনে তাঁহাকে হাসপাতালে লইবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু জামিনে মুক্তিদান করা হইল না। শেষে ছোট লাটের সহৃদতায় তিনি স্বগৃহে স্বজনের সেবা পাইয়া মরিবার অনুমতি পাইলেন। আপীলে মুক্ত হইবার পূর্বেই ভগবান তাঁহাকে দেহ-কারবাস হইতে মুক্ত দিলেন। শেষকালে অশোকের যোগশক্তি বিলক্ষণ বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর দিন বিষ্ণুশক্তিতে অভিভূত হইয়া সকলকে ভগবানের মুক্তি-দায়ক নাম বিতরণ করিয়া নামোচ্চারণ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পূর্বজন্মার্জিত দুঃখফল ক্ষয় করিয়া অশোকের নবজন্ম হইয়াছিল, সেই জন্য এই অনর্থক কষ্ট ও অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। সত্যযুগ প্রবর্তনে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি তাঁহার শরীরে অবতীর্ণ হয় নাই, কিন্তু স্বাভাবিক যোগশক্তি প্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। কর্মের গতি এইরূপেই হয়। পুণ্যবান পাপফল ক্ষয় করিতে অল্পকাল পৃথিবীতে বিচরণ করেন, পরে পাপমুক্ত হইয়া দুষ্টদেহ ত্যাগ ও অন্যদেহ গ্রহণপূর্বক অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ ও জীবের হিত সম্পাদন করিতে আসেন।" ("ধর্ম ও জাতীয়তা")।

সাত

শ্রীঅরবিন্দ বাঙালীর মধ্যে সেই গুণাবলীর সন্ধান পাইয়াছেন, যাহা নবজাতি গড়িয়া তুলিবার জন্য আবশ্যক হইবে। তিনি বলেন যে, বাঙালী সর্বদাই নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছিল এবং অদ্যাবধি ভারতের উচ্চতর চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিতেছে। বাঙালীর এমন ভাবোচ্ছ্বাস ও কল্পনা আছে, যাহা হইতে মহতী প্রেরণার উদ্ভব হইয়া থাকে, এবং এরূপ হৃদয়োন্মাদক ভাবধারা আছে, যাহা মানবজাতিকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করিতে

পারে। তাঁহার মতে হৃদয় দিয়া চিন্তা করিবার মতো অমূল্য গুণও বাঙালীর মধ্যে রহিয়াছে।

"The Bengali has always led and still leads the higher thought of India, because he has eminently the gifts which are most needed for the new race that has to arise. He has emotion and imagination which is open to the great inspirations, the mighty heart-stirring ideas that move humanity when a great step forward has to be taken. He has the invaluable gift of thinking with the heart"...(The brain of India).

'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ইহাও বলিয়াছেন যে, বাঙালীর সুক্ষ্ম মেধা আছে,...অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালী অধিক মাত্রায় অতিমানসের অধিকারী এবং এখন পর্যন্ত অনুন্নত হইলেও উহাকে বিবর্ধিত করিতে হইবে... ; অধিকন্তু এই জাতির প্রবল ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে।

দীর্ঘকাল ধরিয়া শক্তির উপাসক থাকায় এবং বহু শতাব্দী পর্যন্ত তন্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলায় বাঙালী জাতি দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হইয়াছে,—ইহা শ্রীঅরবিন্দের অভিমত। তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙালী ভিন্ন আর কোন জাতি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার সমগ্র জাতীয় চরিত্রের এরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে পারিত না। বাঙালী দিব্য-শক্তির রুদ্র রূপের পূজা যেমন করিয়াছে, তেমনই আবার সুষম রূপের অর্চনাও করিয়াছে। সুন্দর কিংবা রুদ্র যে রূপের ভিতর দিয়াই হউক না কেন, বাঙালী কোন দিনই ভয়ে কিংবা সভক্তি ত্রাসে শক্তি-পূজা হইতে বিরত হয় নাই। যখন তাহার মধ্যে ভাগবতী শক্তি প্রবাহিত হইয়াছিল, তখন সে তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে কিছুমাত্র ভয় পায় নাই;

এবং সেই অসীমের প্রেরণা তাহাকে যে কোথায় লইয়া যাইবে, তৎসম্বন্ধে একেবারে না ভাবিয়া-চিন্তিয়াই সে নিঃশঙ্ক-চিত্তে উহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহারই পারিতোষিক-স্বরূপ শক্তির পূর্ণ আধারে সে পরিণত হইয়াছে; ইহাই বর্তমান জগতে অসীমের ইচ্ছা ও শক্তির সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং দ্রুত অনুভূতক্ষম ও সংবিৎশীল আধার।

বাঙালী-চরিত্রের গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। 'কর্মযোগিন্' পত্রিকার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তিনি সে আলোচনাও করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—ভারতের অন্যান্য জাতির মতো বাঙালী জাতিরও জ্ঞানার্জনে যথেষ্ট ত্রুটি আছে, শিক্ষা-দীক্ষার পরিমাণও অত্যন্ত অল্প এবং শিক্ষা-দান ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান একেবারেই দূষিত। স্থির, পরিমিত ও ব্যাপক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার ক্ষমতায় বাঙালী ভারতের অন্যান্য জাতি, যথা মাদ্রাজী ও মারাঠীর তুলনায় নিম্ন স্তরে রহিয়াছে।

পূর্বোল্লিখিত রচনার মাধ্যমে বাঙালী-চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইবার পূর্বেও শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ভাষণে বাঙালীর অন্যান্য দোষের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি দোষ দেখাইয়া দিয়া স্বজাতিকে তাহা শোধরাইয়া লইবার জন্য উপদেশও দিয়াছেন। তিান দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—আমরা বাঙালীরাই তো বিদেশীদের অধীনে চাকরি লইয়াছিলাম। আমরা বিদেশীদের ডাকিয়া আনিয়াছি এবং তাহাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের এতটা পতন হইয়াছে যে, আমাদের রক্ষা করিবার জন্য, শিক্ষা দিবার জন্য এবং এমন কি আমাদের আহারাদির ব্যবস্থার জন্য অপরের সাহায্য আবশ্যক। আমাদের আত্মনির্ভরশীলতা এমন ভাবেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে যে, মানব-জীবনে এই সমুদয় কার্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা আজ আর আমাদের নাই।

শ্রীঅরবিন্দ মানিকতলা বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হইবার প্রায়

তিন সপ্তাহ পূর্বে ১৯০৮ সনের ১২ই এপ্রিল চব্বিশ পরগনার বারুইপুরের জনসভায় যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে ওই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

ইংরেজ বণিকলক্ষ্মীর আনীত রাজসিংহাসনকে অভিষিক্ত করিয়া লইয়া বাংলা যে পাপ করিয়াছিল, তাহার প্রায়শ্চিত্তও বাঙালীকেই আর সকলের আগে করিতে হইয়াছে। বাংলার তরুণ দধীচিরাই বুকের তাজা রক্ত দিয়া সে পাপ ক্ষালনের কার্য সর্বপ্রথম আরম্ভ করে। বাঙালী মনীষী ও দেশনায়কেরাই জাতিকে মুক্তি-পথের সন্ধান দিলেন। জাতীয় মুক্তি-সাধনায় বাঙালী যে পথিকৃৎ, ইহা তো ঐতিহাসিক সত্য।

আট

উত্তরকালে বাঙালীর জীবন কিরূপ হইবে, তৎসম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ যে-বাণী দিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে আজিকার চরম-দুর্দশাগ্রস্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাঙালীর প্রাণে বল আসিবে—বাঙালীর হতাশ ও অবসন্ন মনে আশার সঞ্চার হইবে। তিনি বলিয়াছেন:

"ভগবানের অপার্থিব করুণা কেবল বাঙ্গালীই যে লাভ করছে এরূপ মনে কর' না। জগতের সকল মানুষের উপরই সমান ভাবে ইহার বর্ষণ চ'লছে, আধার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র। বাঙ্গালীর আধার বড় উপযোগী হ'য়ে উঠেছে, চৈতন্য-যুগের পর থেকে বাংলায় যে ধর্মস্রোত বহেছে, তার তুলনায় বর্তমান যুগে উহার বেগ অত্যন্ত অধিক হ'লেও, বাঙ্গালী জাতি উহা অচঞ্চলচিত্তে অবধারণ করছে। কোথাও কোথাও যে শ্রীচৈতন্যের মত দশাপ্রাপ্তির কথা শুনতে পাও, উহা আধারের অসমর্থতা ভিন্ন আর কিছুই নয়; এইরূপ লীলালক্ষণ প্রকাশ হ'লেও এমন দিন আসছে, আকণ্ঠ অমৃত

পান ক'রেও বাঙ্গালী সাধারণ মানুষের মত সাধারণ ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র কার্যও অতি নিপুণভাবে সম্পন্ন ক'রবে।

"বাঙ্গালীর জীবন অতি শীঘ্র পুলকপূর্ণ হবে। বাঙ্গালী আপনার নামরূপের সকল সংস্কার একেবারেই ভুলে' যাবে। বাঙ্গালীর অন্তর যতই জ্যোতির্ময় হয়ে উঠ্‌বে, গীতা ও উপনিষদের প্রতি বর্ণ বাঙ্গালীর নিকট কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে থাক্‌বে না, উহা সত্য ও মূর্ত হয়ে উঠ্‌বে, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল ও আশাপূর্ণ।"

শ্রীঅরবিন্দ এই বাণী দিয়াছেন আজ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি প্রকাশ্যে দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, ভগবান তোমাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন, তোমাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীঅরবিন্দের সে বাণী তো নিষ্ফল হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দের ঋষি-দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর পুলকপূর্ণ জীবনের এবং বড় উজ্জ্বল ও আশাপূর্ণ ভবিষ্যতের যে রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা কি বাস্তব হইয়া উঠিবে না? শ্রীঅরবিন্দ মহাপুরুষ, শ্রীঅরবিন্দ ঋষি। মহাপুরুষ-বাণী নিত্য, ঋষি-বাণী শাশ্বত। আমরা হয়ত বাঙালীর সেই পুলকপূর্ণ জীবন এবং উজ্জ্বল আশাপূর্ণ ভবিষ্যৎ দেখিয়া যাইতে পারিব না। কিন্তু এই আশা লইয়া তো মরিতে পারিব, মহাপুরুষ-বাণী কখনও বিফল হয় না, ঋষি-বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। *

---

* শনিবারের চিঠি—শ্রাবণ ১৩৫৮

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন লোকাতীত প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী। শিক্ষা-লাভের জন্য তাঁহার পিতা স্বনামখ্যাত ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ তাঁহাকে সাত বৎসর বয়সে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর কাল তথায় ইংরেজ পরিবারে থাকিয়া তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আঠার বৎসর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেন। সেই পরীক্ষায় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'রেকর্ড' নম্বর পাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ক্লাসিক্‌স্‌ ট্রাইপস্‌ (Classics Tripos) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ইংরেজী ভাষায় একজন সুলেখক ও সুকবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সুধী-সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল বিলাতে থাকার দরুন অরবিন্দ তাঁহার মাতৃভাষা বাংলা প্রায় ভুলিয়া যান; তিনি বাংলায় ভাল করিয়া কথাও বলিতে পারিতেন না। যিনি মাতৃভূমিকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন, তিনি কখনও মাতৃভাষা সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারেন না। একুশ বৎসর বয়সে অরবিন্দ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু তাঁহাকে প্রায় বার বৎসর বাস করিতে হইয়াছিল বাংলার বাহিরে বরোদা রাজ্যে। এই সমুদয় প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও অরবিন্দ বরোদায় বাস কালে মাতৃভাষা শিখিলেন; বাংলা ভাষা আয়ত্ত করিলেন বলিলেই ঠিক হইবে। তৎকালে তিনি সংস্কৃত ভাষাও শিখিলেন। বরোদায় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের নানাবিধ গ্রন্থ— তৎসঙ্গে বেদ, উপনিষদ্‌, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও কালিদাসের কাব্য ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। বাংলা সাহিত্যের

অধ্যয়নও চলিল। বঙ্কিম-সাহিত্যের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির গ্রন্থাবলী তিনি ভাল করিয়াই পড়িয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় অরবিন্দকে বাংলা শিখাইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বরোদায় গিয়াছিলেন, এবং তাহার সঙ্গে কিছুকাল একত্রে বাস করিয়া তাহাকে বাংলা শিখাইয়াছিলেন। বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে তাহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, তিনি কিরূপ যত্নের সহিত বঙ্কিম-সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অরবিন্দ বাংলা ভাষায় লিখিতে এবং কথাবার্তা বলিতে পারিলেও কোন দিন জনসভায় বাংলায় ভাষণ দান করেন নাই। সেজন্য তিনি প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশও করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি ৺বিপিনচন্দ্র পাল, ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতির সহিত ২৪ পরগনার বারুইপুরে এক স্বদেশী সভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বাংলায় না বলিয়া ইংরেজীতে বলিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি আরম্ভেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। বাংলা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করা সত্ত্বেও তিনি যে জনসভায় কোন দিন বাংলায় বক্তৃতা দেন নাই, তাহার প্রধান কারণ উচ্চারণের ত্রুটি বলিয়াই অনুমান হয়। শ্রীঅরবিন্দের সহিত একাধিক বার বাংলায় কথাবার্তা বলার এবং তাঁহাকে বাংলায় কথাবার্তা বলিতে শোনার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। যদিও তাঁহার কথাবার্তায় ভাষাগত কোন ভুল থাকিত না, কিন্তু উচ্চারণ শুনিয়া মনে হইত না—বাঙালীর মুখে বাংলা শুনিতেছি।

শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগও ছিল গভীর। সুতরাং অল্প কাল মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তিনি বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলায় লিখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য

হইল প্রসাদ-গুণ। জটিল দার্শনিক বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত বাংলা প্রবন্ধগুলিও দর্শনশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন অসুবিধা হয় না। তাঁহার প্রত্যেকটি রচনাই চিন্তাশীলতায় সমৃদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দের লেখনীর গতি বিভিন্নমুখী ছিল। বিষয়-ভেদে তাঁহার রচনা-শৈলীও পরিবর্তিত হইত। তাঁহার বাংলা গদ্য-রচনার পরিচয় মিলিবে এই কয়েকখানা পুস্তক হইতে— (১) 'অরবিন্দের পত্র', (২) 'কারাকাহিনী', (৩) 'ধর্ম ও জাতীয়তা', (৪) 'জগন্নাথের রথ', (৫) 'অরবিন্দ মন্দিরে'। এই সমুদয় পুস্তক প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন চন্দননগরের 'প্রবর্তক পাব্‌লিসিং হাউস্‌'। এইজন্য 'প্রবর্তক সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠিতা মতিলাল রায়ের নিকট বাংলা ও বাঙালী কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী। প্রথম পুস্তকের 'নিবেদন'-এ মতিলাল রায় লিখিয়াছেন :

"এই পুস্তিকায় প্রকাশিত পত্র তিনখানি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৪৮নং গ্রে স্ট্রীটে অরবিন্দবাবুর বাসায় যখন খানাতল্লাশী হয়, সেই সময়ে পাওয়া যায়। পরে এগুলি আলিপুরের বোমার মামলায় আদালতে উপস্থিত করা হয়। বিচারে এই পত্র কয়েকখানি হইতে তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

"এই পত্রগুলিতে গোপনে তিনি যে কথা তাঁহার স্ত্রীকে বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত জীবনটাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।"...

পূর্বোল্লিখিত পুস্তিকায় প্রকাশিত তিনখানি পত্র লিখিত হইয়াছিল—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর। প্রথম পত্রখানি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ।

'কারাকাহিনী'তে বর্ণিত হইয়াছে আলিপুরে বোমার মামলার এবং বন্দী-জীবনের আংশিক বিবরণ। শ্রীঅরবিন্দের মাসতুত ভগিনী ৺কুমুদিনী মিত্র বি-এ-সরস্বতী সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' মাসিকপত্রে ১৩১৬

সাল (১৯০৯ খ্রীঃ) অবধি 'কারাকাহিনী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। সেই কাহিনী সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি গোপনে পণ্ডিচেরীতে চলিয়া যান। অসমাপ্ত রচনাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' নামক যে প্রবন্ধটি 'কারাকাহিনী' পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা ১৩১৬ সালের 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ধর্ম ও জাতীয়তা' পুস্তকে গ্রথিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকায় একই বৎসর অর্থাৎ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। তৎকালে তাঁহার সম্পাদনায় 'কর্মযোগিন্' নামে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইতেছিল।

আলিপুর বোমার মামলায় মুক্তিলাভের কিছুকাল পরে তিনি ওই সাপ্তাহিক পত্রিকা দুইখানি প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। তাঁহার গোপনে বাংলা দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার পর 'ধর্ম' এবং 'কর্মযোগিন্' বন্ধ হইয়া যায়। 'ধর্ম ও জাতীয়তা' পুস্তকের প্রবন্ধাবলীর গ্রন্থন হইয়াছে দুইটি খণ্ডে। 'ধর্ম' খণ্ডে এগারটি প্রবন্ধ এবং 'জাতীয়তা' খণ্ডে নয়টি প্রবন্ধ রহিয়াছে। 'ধর্ম' খণ্ডের প্রবন্ধগুলি এই—আমাদের ধর্ম, গীতার ধর্ম, সন্ন্যাস ও ত্যাগ, মায়া, অহঙ্কার, নিবৃত্তি, উপনিষদ, পুরাণ, প্রাকাম্য, বিশ্বরূপদর্শন, স্তবস্তোত্র। প্রবন্ধগুলির নাম হইতেই বুঝা যায় যে, অধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিষয় লইয়াই ওই সমুদয় লিখিত হইয়াছে। 'জাতীয়তা' খণ্ডের প্রবন্ধ হইল এইগুলি—নবজন্ম, জাতীয় উত্থান, অতীতের সমস্যা, স্বাধীনতার অর্থ, দেশ ও জাতীয়তা, আমাদের আশা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, ভ্রাতৃত্ব, ভারতীয় চিত্রবিদ্যা। 'জগন্নাথের রথ' লিখিত হইয়াছে পণ্ডিচেরীতে। ইহাতে গ্রথিত হইয়াছে তিনটি প্রবন্ধ—'জগন্নাথের রথ', 'আর্য আদর্শ ও গুণত্রয়', 'স্বপ্ন'। 'প্রবর্তক' মাসিক পত্রে ওই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। 'অরবিন্দ মন্দিরে' পুস্তিকায় শ্রীঅরবিন্দের যে সকল উক্তি, মতামত, মন্তব্য,

বাণী ইত্যাদি সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, ওই সমুদয় তাঁহার লেখনী-প্রসূত নহে সত্য—কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বলিয়া রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে রহিয়াছে অমূল্য রত্নমালার সঞ্চয়ন। বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে ওই রত্নমালা পরাইয়া দিয়াছেন প্রবর্তক সঙ্ঘের শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক ও শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত। এই সম্পর্কে মণীন্দ্রবাবু তাঁহার 'শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"…১৯২০ হইতে ১৯২৭ অবধি যে কয় বৎসর আমার ফরাসী ভারতের সাধারণ সভার সভ্যরূপে (Conseiller General) পণ্ডিচেরী যাইবার সুযোগ হইয়াছিল, আমি তথায় যাইলেই শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে আসিবার এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সাধন কথা ও যোগনির্দেশ শুনিবার অবসর পাইতাম। এই সকল সাধনানির্দেশ আমি পত্রাকারে শ্রদ্ধেয় মতিবাবুর নিকট লিখিতাম। এই সকল পত্রের মধ্যে অনেকগুলিই 'অরবিন্দ মন্দিরে' নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, উক্ত পুস্তকের বাকী প্রবন্ধগুলি পণ্ডিচেরীতে অবস্থান কালে শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের লেখনী-প্রসূত।" *

'অরবিন্দ মন্দিরে' পুস্তিকা সম্বন্ধে অনুরূপ কথা শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তও আমাকে বলিয়াছেন। আমার অনুরোধে তিনি ওই সম্পর্কে গত ইং ১৯।৮।৫৪ তারিখে চন্দননগর হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"অরবিন্দ মন্দিরে'র লেখাগুলি পণ্ডিচেরীতে মণীন্দ্রবাবু ও আমার থাকা-কালীন লিখিত পত্রাবলী হইতে গৃহীত। মণীন্দ্রবাবু গিয়াছিলেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ; আমি যাই—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং তিন মাস কাল ওখানে থাকি। শ্রীঅরবিন্দ স্নেহভরে

---

* প্রবর্তক—১৩৫৭, মাঘ।

তাঁহার পাশের ঘরে আমার স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গে দুইবার দেখা হইত ও একত্র সকলের সঙ্গে বসিয়া কথাবার্তা বা ধ্যান চলিত। এইরূপে দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে যা' কথা হইত, সেইদিনই বা তৎপরদিন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পত্রাকারে পূজনীয় সঙ্ঘ-গুরুর নিকট চন্দননগরে পাঠাইয়া দিতাম। মণীন্দ্রবাবুর এবিষয়ে কথা তাঁহার প্রবন্ধটিতেই পাইবেন। যতদূর সম্ভব 'অরো'র উক্তিগুলি তাঁহার নিজেরই ভাষায় আমি দিয়াছি। তবে যেখানে কিছু মন্তব্য বা উচ্ছ্বাস আছে, তাহা আমার মনের রঙে রাঙান মাত্র।"

'অরবিন্দ মন্দিরে' গ্রথিত লেখাগুলিও 'প্রবর্তক' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'জগন্নাথের রথ' পুস্তিকাখানির সম্পর্কে অরুণবাবু পূর্বোক্ত পত্রে লিখিয়াছেন :

"জগন্নাথের রথ'—লেখা শ্রীঅরবিন্দের নিজেরই। উহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া আমরা 'Standard bearer'-এ ছাপাইয়াছিলাম। 'জগন্নাথের রথ' প্রবর্তকের জন্য লিখিত শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তরচিত প্রবন্ধ। বাংলাটাই original."

অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের পূর্বোল্লিখিত বাংলা রচনাবলী হইতে উদ্ধৃতি দিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে ওই সমুদয় আস্বাদন করিবার সুযোগ দিব। তাঁহার সহধর্মিণী স্বর্গীয়া মৃণালিনী দেবীকে লিখিত প্রথম পত্রখানি হইতে কিদয়ংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"...তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়ই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক, অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামি বলে, তবে পাগলের

কর্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহস্র লোকের মধ্যে দশজন অসাধারণ, সেই দশজনের মধ্যে একজন কৃতকার্য হয়। আমার কর্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রী-লোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখদুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, দুঃখই দেয়।"

ইহার পর 'হিন্দুধর্মের প্রণেতৃগণ' স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও কর্তব্য সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দিয়া তিনি লিখিয়াছেন :

"স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী,—তিনি যে-কার্যই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য নির্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।

"এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্মের পথ ধরিবে, না নূতন সভ্যধর্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামির পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্মস্কুলে পড়িয়া থাক, তবু তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্ব-

পুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে।”

তারপর শ্রীঅরবিন্দ লিখিতেছেন যে, তাঁহার ‘তিনটি পাগলামি আছে।’ সেই তিনটি পাগলামির বিশদ বর্ণনাও দিলেন। এই স্থলে প্রথম পাগলামির বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

...“প্রথম পাগলামি এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্র বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি। জীবনের অর্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পুরিয়া কৃতার্থ হয়।

“আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্মকার্যে ব্যয় করা। যে টাকা সরোজিনী বা উষাকে দিয়াছি তার জন্য কোন অনুতাপ নাই, পরোপকার ধর্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম, কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটী ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।

"কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা।"...

স্বামী তাঁহার উচ্চ জীবনাদর্শ স্ত্রীকে কি সুন্দর করিয়া চিত্তাকর্ষক প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এখন শুনাইব 'কারাকাহিনী'র অংশ-বিশেষ। ইহার মধ্যে আছে নানা ব্যক্তি, বস্তু ও বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা। ব্যক্তি ও বস্তুর বিবরণের মধ্যে এমন রচনা-নৈপুণ্য রহিয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে যেন চোখের উপর ভাসিয়া উঠে নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত একখানা আলেখ্য। আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে যে নির্জন কারাগৃহে শ্রীঅরবিন্দকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, উহার বিবরণ দিয়া তৎপর তিনি লিখিতেছেন:

"আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজসরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহৃদয় কর্তৃপক্ষ অতিথি-সৎকারের ত্রুটি করেন নাই। একখানা থালা ও একটি বাটী উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তম-রূপে মাজা হইলে এই আমার সর্বস্ব স্বরূপ থালা বাটীর এমন রূপার ন্যায় চাকচিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে 'স্বর্গজগতে' নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত; তখন এক হাতে আহার করা, আর এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্ট্যন্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটিই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিস ছিল। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্বকার্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও

যোগ্যতা আছে,—জজ, শাসনকর্তা, পুলিস, শুল্ক বিভাগের কর্তা, মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবা মাত্র হইতে পারে,—যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগ কর্তা, পুলিস বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষের কৌন্‌সিলীরও এক শরীরে এক সময়ে প্রীতিসম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য ;—আমার আদরের বাটিরও তদ্রূপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটিতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারি দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকার্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগ সাধনের উপায়-স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিত্যাগের এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইবে? নির্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে যখন আমাদের এক সঙ্গে রাখা হয়, তখন আমার সিভিলিয়ানের অধিকার পৃথকীকরণ হয়,—কর্তৃপক্ষেরা শৌচক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত্র উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু একমাস কালে এতদ্দারা এই অযাচিত ঘৃণা সংযম শিক্ষালাভ হইল। শৌচক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই যেন এই সংযম শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত।”

শ্রীঅরবিন্দ যে কিরূপ পরিহাস-পটু ছিলেন, তাহা পূর্বোল্লিখিত থালা-বাটির রসাল বর্ণনা হইতে কতকটা বুঝা যাইতে পারে। আর একটি বস্তু সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণনা শুনাইতেছি :

“৫টার সময় গরাদ খোলা হয়, আমি হাত মুখ ধুইয়া আবার ঘরে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে ‘লফ্‌সী’ আমার দরজায় হাজির হইল, কিন্তু সেই দিন খাই নাই, কেবল তাহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হইল। ইহার কয়েক দিন পরে প্রথমবার এই পরমান্ন ভোগ হয়। ‘লফ্‌সী’র অর্থ ফেনের সহিত সিদ্ধ ভাত, ইহাই কয়েদীর ছোট

হাজরী। 'লফ্‌সী'র ত্রিমূর্তি বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন 'লফ্‌সী'র প্রাজ্ঞভাব—অমিশ্রিত মূল পদার্থ, শুদ্ধ শিব শুভ্র মূর্তি। দ্বিতীয় দিন 'লফ্‌সী'র হিরণ্যগর্ভ—ডালে সিদ্ধ, খিচুড়ি নামে অভিহিত, পীতবর্ণ, নানা ধর্মসঙ্কুল। তৃতীয় দিনে 'লফ্‌সী'র বিরাট মূর্তি—অল্প গুড়ে মিশ্রিত, ধূসর বর্ণ, কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যের ব্যবহারযোগ্য। আমি প্রাজ্ঞ ও হিরণ্যগর্ভ সেবন সাধারণ মর্ত্য মনুষ্যের অতীত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, এক একবার বিরাটের দু'গ্রাস উদরস্থ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের নানা সদ্‌গুণ ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উচ্চ দরের humanitarianism ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইতাম। বলা উচিৎ 'লফ্‌সী'ই বাঙ্গালী কয়েদীর একমাত্র পুষ্টিকর আহার, আর সবই সারশূন্য। তাহা হইলেও বা কি হইবে? তাহার যেরূপ স্বাদ, তাহা কেবল ক্ষুধার চোটেই খাওয়া যায়, তাহাও জোর করিয়া, মনকে কত বুঝাইয়া তবে খাইতে হয়!"

মামলার প্রাথমিক শুনানী কালে আলিপুরে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লীর আদালতে যে ভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হইয়াছিল, অরবিন্দ উহার প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার অনেক বার এই কল্পনা মনে উদয় হইত যে,…"বৃটিশ বিচারালয়ে না বসিয়া কোন নাটক গৃহের রঙ্গমঞ্চে বা কোন কল্পনাপূর্ণ ঔপনাস্যিক রাজ্যে বসিয়া আছেন।" সরকার পক্ষের কৌন্সিলী নর্টন সাহেবের যে-চিত্র শ্রীঅরবিন্দের লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা শুধু জীবন্ত নহে, উপভোগ্যও বটে। সমগ্র বর্ণনাটা রসে টইটুম্বুর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নহে। তবে যেটুকু দিব তাহা হইতেও পাঠক-পাঠিকারা কতকটা রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। শ্রীঅরবিন্দের বর্ণনায় আছে ঃ

"এই নাটকের প্রধান অভিনেতা সরকার বাহাদুরের কৌন্সিলী নর্টন সাহেব ছিলেন। তিনি প্রধান অভিনেতা কেন, এই নাটকের

রচয়িতা, সূত্রধর (Stage manager) এবং সাক্ষীর স্মারক (prompter) ছিলেন,—এমন বৈচিত্র্যময় প্রতিভা জগতে বিরল।......

"হলিংশেদ হল ও প্লুটার্ক যেমন সেক্সপিয়রের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পুলিস তেমনি এই মোকদ্দমা-নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের নাটকের সেক্সপিয়র ছিলেন নর্টন সাহেব। তবে সেক্সপিয়রে, নর্টনে এক প্রভেদ দেখিয়াছিলাম। সেক্সপিয়র সংগৃহীত উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিতেন; নর্টন সাহেব ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, সংলগ্ন অসংলগ্ন, অনরো অনীয়ান, মহতো মহীয়ান্ যাহা পাইতেন একটিও ছাড়েন নাই; তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাসৃষ্ট প্রচুর suggestion, inference, hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর plot রচনা করিয়াছিলেন যে সেক্সপিয়র, ডেফো ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাস-লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নিন্দুক বলিতে পারেন যে, যেমন ফলষ্টাফের হোটেলের হিসাবে এক আনা খাদ্য ও অসংখ্য গ্যালন মদ্যের সমাবেশ ছিল, তেমনই নর্টনের plot-এ এক রতি প্রমাণের সঙ্গে দশ মণ অনুমান ও suggestion ছিল। কিন্তু নিন্দুকও plot-এর পারিপাট্য ও রচনা-কৌশল প্রশংসা করিতে বাধ্য। নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের Paradise Lost-এর সয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold bad man. আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পাতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, অরবিন্দ ঘোষ।"...

শ্রীঅরবিন্দের লেখনীতে বার্লী সাহেবের যে-রূপটি লিখিত হইয়াছে, তাহা যেন চলচ্চিত্রের নায়কের ছবির মতোই জীবন্ত। সেই ছবিখানি এই :

"নর্টন সাহেব যদি নাটকের রচয়িতা, প্রধান অভিনেতা ও সূত্রধর হন, ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লীকে নাটককারের পৃষ্ঠপোষক বা patron বলিয়া অভিহিত করা যায়। বার্লী সাহেব বোধ হয়, স্কচ্‌জাতির গৌরব। তাঁহার চেহারা স্কটলণ্ডের স্মারক চিহ্ন। অতি সাদা,অতি রোগা,দীর্ঘ দেহযষ্টির উপর ক্ষুদ্র মস্তক দেখিয়া মনে হইত যেন অভ্রভেদী অক্‌টারলোনী মনুমেণ্টের উপর ক্ষুদ্র অক্‌টারলোনী বসিয়া আছেন, বা ক্লিয়পাত্রার obelisk-এর চুড়ায় একটী পাকা নারিকেল বসান রহিয়াছে। তাঁহার চুল ধুলার বর্ণ (sandy haired) এবং স্কটলণ্ডের সমস্ত হিম ও বরফ তাঁহার মুখের ভাবে জমিয়া রহিয়াছে। যাঁহার এত দীর্ঘ দেহ, তাহার বুদ্ধিও তদ্রূপ হওয়া চাই, নচেৎ প্রকৃতির মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু এই বিষয়ে বার্লী-সৃষ্টির সময়ে প্রকৃতি দেবী বোধ হয় একটু অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি মারলো এই মিতব্যয়িতা 'infinite riches in a little room'—ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে অসীম ধন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বার্লী দর্শনে কবির বর্ণনার বিপরীত ভাব মনে উদয় হয়, infinite room-এ little riches. বাস্তবিক এই দীর্ঘ দেহে এত অল্প বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া দুঃখ হইত এবং এই ধরণের অল্পসংখ্যক শাসনকর্তা দ্বারা ত্রিশ কোটি ভারতবাসী শাসিত হইয়া রহিয়াছে স্মরণ করিয়া ইংরাজের মহিমা ও ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর উপর প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইত। বার্লী সাহাবের বিদ্যা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর জেরার সময় প্রকাশ হইয়াছিল।...

"প্রথম হইতে তিনি নর্টন সাহেবের পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার বশ হইয়াছিলেন। এমন বিনীত ভাবে

নর্টনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেন, নর্টনের মতে মত দিতেন, নর্টনের হাসিতে হাসিতেন, নর্টনের রাগে রাগিতেন যে, এই সরল শিশুর আচরণ দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রবল স্নেহ ও বাৎসল্য ভাব মনে আবির্ভূত হইত। বার্লী নিতান্ত বালকস্বভাব। কখনও তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া ভাবিতে পারি নাই, বোধ হইত যেন স্কুলের ছাত্র হঠাৎ স্কুলের শিক্ষক হইয়া স্কুলের শিক্ষকের উচ্চ মঞ্চে আসীন হইয়াছেন। সেইভাবে তিনি কোর্টের কার্য চালাইতেন।”...

এইক্ষণ শ্রীঅরবিন্দের ‘ধর্ম ও জাতীয়তা’ হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি। ‘আমাদের ধর্ম’ প্রবন্ধটি ওই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ ; সেইটি সাপ্তাহিক ‘ধর্ম’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

...“আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম প্রচার ও সনাতন-ধর্মাশ্রিত জাতিধর্ম ও যুগধর্ম অনুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী, আর্য-জাতির বংশধর, আর্য-শিক্ষা ও আর্য-নীতির অধিকারী। এই আর্য-ভাবই আমাদের কুলধর্ম ও জাতিধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম-কর্ম আর্য-শিক্ষার মূল ; জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয়—আর্য-চরিত্রের লক্ষণ। মানব-জাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্য-জাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্মের চরিতার্থতা। আমরা ধর্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্মসঙ্কর ও ভ্রান্তি-সঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়া আর্য-শিক্ষা ও নীতিহারা। আমরা আর্য-জাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্র-ধর্মস্বরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবল-পদ-দলিত ও দুঃখপরম্পরা-প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে, জাতির রক্ষা

আমাদের প্রথম কর্তব্য। জাতি-রক্ষার উপায় আর্য-চরিত্রের পুনর্গঠন। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী, শক্তিমান, বিনীত হয়, সমস্ত জাতিকে, বিশেষতঃ যুবক-সম্প্রদায়কে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ ও আর্যভাব-উদ্দীপক কর্মপ্রণালী দেওয়া আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। এই কার্যে কৃতার্থ না হওয়া পর্যন্ত সনাতন ধর্মপ্রচার ঊষর ক্ষেত্রে বীজবপন মাত্র।"

পরাধীন ভারতে জাতির জন্য ঋষি শ্রীঅরবিন্দ যে জীবনাদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, স্বাধীন ভারতেও উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই জীবনাদর্শকে সার্থক করিবার জন্য তিনি যে-পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন, স্বাধীন ভারতবাসীর তাহা অনুসরণ করিয়া চলা কর্তব্য।

'ধর্ম' পত্রিকার প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র। কিন্তু প্রত্যেকটিকে রত্নের আকর বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। অল্প পরিসরে অনেক মূল্যবান কথা বলা শ্রীঅরবিন্দ-প্রতিভার একটা বিশেষত্ব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মাত্র এই চারিটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি;—নিবৃত্তি, উপনিষদ্, পুরাণ, প্রাকাম্য। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিচার-বিশ্লেষণ, ভাব ও মননশীলতার সম্পদে প্রতিটি সন্দর্ভ পূর্ণ, 'infinite riches in a little room' অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে অসীম ধন' বলা যাইতে পারে। 'নিবৃত্তি' হইতে ছোট একটি বাণী শুনাইতেছি:

"...সমস্ত জীবন ধর্মক্ষেত্র, সংসারও ধর্ম। কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোচনা ও ভক্তির ভাব ধর্ম নহে, কর্মও ধর্ম। আমাদের সমস্ত সাহিত্য ব্যাপ্ত করিয়া এই মহতী শিক্ষা সনাতন ভাবে রহিয়াছে—এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।"

'উপনিষদ্' প্রবন্ধ হইতেও যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি:

..."ঋগ্বেদের বক্তা ঋষিগণ ঐশ্বরিক প্রেরণায় আধ্যাত্মিক

জ্ঞান শব্দ ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, উপনিষদের ঋষিগণ সাক্ষাদ্দর্শনে সেই জ্ঞানের স্বরূপ দেখিয়া অল্প ও গম্ভীর কথায় সেই জ্ঞান ব্যক্ত করিলেন। অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি কেন, তাহার পরে যত দার্শনিক চিন্তা ও বাদ ভারতে, য়ুরোপে, এশিয়ায় সৃষ্ট হইয়াছে, Nominalism, Realism, শূন্যবাদ, ডারুয়িনের ক্রমবিকাশ, কম্‌তের Positivism, হেগল, কান্ত্, স্পিনোজা, শোপনহাওর, Utilitarian-ism, Hedonism, সকলই উপনিষদের ঋষিগণের সাক্ষাদ্দর্শনে দৃষ্ট ও ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যত্র যাহা খণ্ড ভাবে দৃষ্ট, সত্যের অংশমাত্র হইয়াও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচারিত, সত্য মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া বিকৃত ভাবে বর্ণিত, তাহা উপনিষদে সম্পূর্ণভাবে, নিজ প্রকৃত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, শুদ্ধ অভ্রান্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।”

'ধর্ম ও জাতীয়তা' পুস্তকে গ্রথিত প্রবন্ধাবলী লিখিত হইয়াছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগের অন্ত্য পর্বে। 'জাতীয়তা' খণ্ডের প্রবন্ধমালা সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—স্বাধীনতা-সংগ্রামের মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দের অগ্রগামী রাজনীতিক চিন্তাধারায় ও দূরদর্শিতায়। 'অতীতের সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

…“ভগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার জ্বালাময়ী শক্তি জাতির শিরায় শিরায় খরতর-বেগে বহিতে লাগিল। তাহার সহিত স্বদেশ-প্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবকবৃন্দকে অভিভূত করিল। আমরা পাশ্চাত্য জাতি নহি, আমরা এসিয়াবাসী, আমরা ভারতবাসী, আমরা আর্য। আমরা জাতীয়-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয়-ভাব পরিস্ফুট হয় না। সেই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা। যে দিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ ভগবান

জাগিল, মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ইষ্ট দেবী, এই বেদান্ত-শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ। যেমন জীব ভগবানের অংশ, তাহার শক্তি ভগবানের শক্তির অংশ, তেমনই এই সপ্তকোটী বঙ্গবাসী, এই ত্রিংশ কোটী ভারতবাসীর সমষ্টি সর্বব্যাপী বাসুদেবের অংশ ; এই ত্রিংশ কোটীর আশ্রয়, শক্তিস্বরূপিণী বহুভুজান্বিতা, বহুবল-ধারিণী ভারত-জননী, ভগবানের একটী শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেহ-বিশেষ। এই মাতৃপ্রেম, মাতৃমূর্তি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল। সেই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কি ?

"তাহার পরে আর্য-জাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার। প্রথম আর্য-চরিত্র ও শিক্ষা, দ্বিতীয় যোগশক্তির পুনর্বিকাশ, তৃতীয় আর্যোচিত জ্ঞানতৃষ্ণা ও কর্মশক্তির দ্বারা নবযুগের আবশ্যক সামগ্রী সঞ্চয় এবং কয় বর্ষের উন্মাদিনী শৃঙ্খলিত ও স্থিরলক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া মাতৃকার্যোদ্ধার। এখন যে সব যুবকবৃন্দ দেশময় পথান্বেষণ ও কর্মান্বেষণ করিতেছেন, তাঁহারা উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া কিছুদিন শক্তি আনয়নের পথ খুঁজিয়া লউন। যে মহৎ কার্য সমাধা করিতে হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শক্তি চাই। তোমাদিগের পূর্বপুরুষদের শিক্ষায় যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই শক্তি অঘটনঘটন-পটীয়সী। সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন। সেই শক্তিই মা। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও। মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে কার্য সম্পাদন করিবেন যে, জগৎ স্তম্ভিত হইবে। সেই শক্তির অভাবে তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মাতৃমূর্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা করিতে শিখিয়াছ,

এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। কার্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই।”

বাংলা ভাষার উপর শ্রীঅরবিন্দের কিরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহার কতক পরিচয় পূর্বোক্ত প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশেও মিলিবে। প্রবন্ধটির ভাষা এমন ওজস্বিনী ও আবেগপূর্ণ যে, সহজেই প্রাণকে স্পর্শ করে!

অতঃপর ‘জগন্নাথের রথ’ এবং ‘অরবিন্দ মন্দিরে’ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া শ্রীঅরবিন্দের গদ্য-রচনাবলীর আলোচনা সমাপ্ত করিব। ওই পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধ ‘জগন্নাথের রথ’-এর প্রারম্ভ এইরূপ :

“আদর্শ সমাজ মনুষ্য-সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। ঐক্য স্বাধীনতা জ্ঞান শক্তি সেই রথের চারি চক্র।

“মনুষ্যবুদ্ধির গঠিত কিংবা প্রকৃতির অশুদ্ধ প্রাণ-স্পন্দনের খেলায় সৃষ্ট যে সমাজ, তাহা অন্য প্রকার। এটি সমষ্টির নিয়ন্তা ভগবানের রথ নহে, মুক্ত অন্তর্যামীকে আচ্ছাদিত করিয়া যে বহুরূপী দেবতা ভগবৎ-প্রেরণাকে বিকৃত করে, ইহা সমষ্টিগত সেই অহঙ্কারের বাহন। এটি চলিতেছে নানা ভোগপূর্ণ লক্ষ্যহীন কর্মপথে, বুদ্ধির অসিদ্ধ অপূর্ণ সঙ্কল্পের টানে, নিম্ন প্রকৃতির পুরাতন বা নূতন অবশ প্রেরণায়। যতদিন অহঙ্কারই কর্তা, ততদিন প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব ;—লক্ষ্য জানা গেলেও সেদিকে সোজা রথ চালান অসাধ্য। অহঙ্কার যে ভাগবত পূর্ণতার প্রধান বাধা, এই তথ্য যেমন ব্যষ্টির, তেমনই সমষ্টির পক্ষেও সত্য।”

ইহার পরই শ্রীঅরবিন্দ দৃষ্টান্তের দ্বারা সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন যে,—‘সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইহার মালিক আরোহী’ হইলে গতি কি হইবে আর ‘রাজসিক অহঙ্কার কিংবা তামসিক অহঙ্কারে’র বেলায়ই বা গতি কি হইবে? তাঁহার মতে—

“তিনটির মধ্যেই যদি পছন্দ করা অনিবার্য হয়, আরও উচ্চতর

চিন্তা যদি আমরা পরিহার করি, তবে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের নূতন রথ নির্মাণ করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জগন্নাথের রথ যতদিন সৃষ্ট না হয়, আদর্শ সমাজও ততদিন গঠিত হইবে না। সেইটীই আদর্শ, সেইটীই চরম, গভীরতম উচ্চতম সত্যের বিকাশ ও প্রতিকৃতি। মনুষ্যজাতি গুপ্ত বিশ্বপুরুষের প্রেরণায় তাহাকেই গড়িতে সচেষ্ট, কিন্তু প্রকৃতির অজ্ঞান-বশে গড়িয়া বসে অন্যরূপ প্রতিমা—হয় বিকৃত অসিদ্ধ কুৎসিত, নয় চলনসই অর্ধসুন্দর বা সৌন্দর্য সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ, শিবের বদলে হয় বামন, নয় রাক্ষস, নয় মধ্যম লোকের অর্ধদেবতা।"

'জগন্নাথের রথ' পুস্তিকার 'স্বপ্ন' নামক শেষ লেখাটাকে প্রবন্ধ বলিলে ঠিক হইবে না। গল্পের পটভূমিকায় একটি জটিল দার্শনিক তত্ত্বকে সরল করিয়া বুঝাইয়া বলা হইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্বটি হইল—'মনের অবস্থায় সুখ, মনের অবস্থায় দুঃখ। সুখ-দুঃখ মনের বিকার মাত্র।' গল্পের পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে, গল্প বলার ভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক। দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া কথাকে প্রবন্ধে রূপান্তরিত করা হয় নাই কিংবা কথার নিজস্ব রসালতা নষ্ট করা হয় নাই।

'অরবিন্দ মন্দিরে' শ্রীঅরবিন্দ বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারই একাংশ এখন শুনাইতেছি :

…"বাংলায় ভাবকে সহজেই পাওয়া যায়, ভাবের পাগল অনেক হয়েছে, ভাবের সঙ্গে জ্ঞানের মিশ্রণ চাই, তাই বাংলাকে বেদান্ত-চর্চা করতে হবে ; ভাব ভক্তির দ্যোতক, ভক্তি থাকলে ভগবানের কার্য করবার শক্তির অভাব হবে না, কিন্তু জ্ঞানের বিকাশ এতদ্দ্বারা হবে না। জ্ঞান না এলে বৃহৎ সৃষ্টি অসম্ভব ; জ্ঞানেই ভগবানকে অনন্ত ভাবে অবধারণ করা যায়, অনন্ত বৈচিত্র্য একত্র সমাহার না করতে পারলে ক্ষুদ্র সৃষ্টিই অনিবার্য হয়ে ওঠে, ক্ষুদ্রতা ভাগবত ইচ্ছার বিরোধী ধর্ম, উহা প্রতি আঘাতে

শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তোমরা বৃহৎ হও, জ্ঞানকে পুরোভাগে ধারণ কর। জ্ঞানের অনুগামী সমতা—সমতাই বৃহৎ সৃষ্টির বীজ মন্ত্র।”

“বাংলায় আছে ভক্তি, আছে কর্ম। নূতন সৃষ্টির জন্য তার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, তোমরা তার সঙ্গে জ্ঞানকে সংযুক্ত কর, দেখবে তোমাদের সঙ্ঘ জগজ্জয়ী হবে। জ্ঞানের সাধনা যদি উপেক্ষা কর, সৃষ্টি যত বৃহৎ ব'লেই মনে কর না, উহা কোন মতেই স্থায়ী হবে না। চৈতন্যের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় যা কিছু হয়েছে, সবের মধ্যেই এই জ্ঞানের অভাব ছিল ;—তাই কোন সৃষ্টিই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি।”...

জ্ঞানের অভাবে বাংলা ও বাঙালী যে লক্ষ্য স্থলে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তাহাও শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই অভাবের পূরণ হইলেই অর্থাৎ 'জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা' হইলেই অন্যান্য সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। তিনি বলিতেছেন ঃ

“তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান চাই, নতুবা পতনের খুবই আশঙ্কা আছে। কর্ম ও ভক্তি বাংলার মাটীর গুণ, মানুষের দোষ এ ক্ষেত্রে কিছু নেই ; সেই জন্য মাঝে মাঝে এই দু'টোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাধন করতে হবে। বাংলায় ক্ষত্রিয়ত্বই ফুটে উঠেছে—কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের পরিস্ফুরণ এখনও হয়নি। তোমরাও আজ কর্মোন্মাদ হয়েছ, ভক্তির প্রবাহে হাবুডুবু খাচ্ছ ;—কিন্তু জ্ঞানের অভাবে সব যে ব্যর্থ হবে, সেই জন্য এত কথা বলা। বাংলায় যেমন কর্ম ও ভক্তি আছে, মাদ্রাজে তেমনি জ্ঞান আর ভক্তি আছে, শক্তির বড় অভাব। উভয়ের যদি সংমিশ্রণ সম্ভব হ'ত—তা হ'লে কাজ মন্দ হ'ত না—কিন্তু ইহা সম্ভব নয়। মাদ্রাজের বুদ্ধি বিপথগামী, গুজরাট সঙ্কীর্ণ, বোম্বাই চালাক, বুদ্ধির গভীরতা নাই, সেইজন্য কারু দ্বারা কার্যারম্ভ হবে না—বাংলাকেই সব করতে হবে ; কেননা এখানে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হ'লেই সব মিটে যায়—আর

সত্য সত্যই সকল প্রদেশই বাংলার দিকেই চেয়ে আছে,—বাঙালীই মুক্তিমন্ত্রের ঋষি হবে।

"বাঙালীর বুদ্ধি আছে—কিন্তু উহা জ্ঞান নয়। বুদ্ধি ক্ষিপ্র বটে, কিন্তু গভীর নয়, বিরাট নয়। বুদ্ধি শান্ত গভীর বিরাটে পরিণত হ'লেই জ্ঞানের উদয় হবে। ভক্তি যতই প্রবল হোক, জ্ঞান প্রদীপ্ত না হ'লে ভাবচ্যুতি আসবেই, সেজন্য বাঙালীকে জ্ঞানের দিকে অধিক ঝোঁক দিতে হবে।"

শ্রীঅরবিন্দের 'দুর্গা-স্তোত্র' একটি চমৎকার রচনা। তাঁহার সম্পাদিত 'ধর্ম' পত্রিকার ১৩১৬ সনের আশ্বিন সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। সমগ্র রচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি :

দুর্গা-স্তোত্র

"মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি সর্বশক্তিদায়িনি মাতঃ শিবপ্রিয়ে! তোমার শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি—শুন মাতঃ, উর বঙ্গদেশে—প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! যুগে যুগে মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য করিয়া তোমার আনন্দধামে ফিরিয়া যাই। এইবার জন্মিয়া তোমারই কার্যে ব্রতী আমরা, শুন মাতঃ, উর বঙ্গদেশে—সহায় হও॥

মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি, ত্রিশূলধারিণি, বর্ম-আবৃত—সুন্দর শরীরে মাতঃ জয়দায়িনি! তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্তি দেখিতে উৎসুক। শুন মাতঃ, উর বঙ্গদেশে—প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! বলদায়িনি, প্রেমদায়িনি, জ্ঞানদায়িনি, শক্তি-স্বরূপিণি ভীমে, সৌম্য-রৌদ্র-রূপিণি! জীবন-সংগ্রামে, ভারত-

সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান ॥

মাতঃ দুর্গে! জগৎশ্রেষ্ঠ ভারত-জাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তুমি মাতঃ, গগনপ্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমির-বিনাশী আভায় উষার প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার কর, মাতঃ, তিমির বিনাশ কর ॥

মাতঃ দুর্গে! শ্যামলা সর্বসৌন্দর্য-অলঙ্কৃতা জ্ঞান প্রেম শক্তির আধার বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি, এতদিন শক্তি সংহরণে আত্মগোপন করিতেছিলে। আগত যুগ, আগত দিন, ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে, এস মাতঃ, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে, তোমার প্রভাবে মহৎ কার্যের মহৎ ভাবেই উপযুক্ত হই। বিনাশ কর ক্ষুদ্রতা, বিনাশ কর স্বার্থ, বিনাশ কর ভয় ॥

মাতঃ দুর্গে! কালীরূপিণি নৃমুণ্ডমালিনি, দিগম্বরি, কৃপাণপাণি দেবি অসুরবিনাশিনি! ক্রূরনিনাদে অন্তস্থ রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নির্মল যেন হই এই প্রার্থনা, মাতঃ, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! স্বার্থ ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মাণ ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎ প্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্য-সংকল্প কর; আর অল্পাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়-ভীত যেন না হই ॥

মাতঃ দুর্গে! যোগশক্তি বিস্তার কর। তোমার প্রিয় আর্য-সন্তান। লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধাশক্তি, ভক্তিশ্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সত্যজ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ কর; মানব সহায়ে দুর্গতিনাশিনি জগদম্বে, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! অন্তস্থঃ রিপু সংহার করিয়া বাহিরের বাধা-বিঘ্ন নির্মূল কর। বলশালী পরাক্রমী উন্নতচেতা জাতি, ভারতের কাননে,

উর্বর ক্ষেত্রে, গগন-সহচর পর্বততলে, পূতসলিলা নদীতীরে, একতায়, প্রেমে, সত্যে, শক্তিতে, শিল্পে, সাহিত্যে, বিক্রমে, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক, মাতৃচরণে এই প্রার্থনা, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর। যন্ত্র তব, অশুভ-বিনাশী তরবারী তব, অজ্ঞান-বিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবকগণের এই বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভ-হন্ত্রী হইয়া তরবারী ঘুরাও, জ্ঞানদীপ্তি-প্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না; শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ, আমাদের মনে, প্রাণে, শরীরে—প্রকাশ হও ॥

বীরমার্গ-প্রদর্শিনি, এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবিচ্ছিন্ন দুর্গা পূজা, আমাদের সর্ব কার্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে—প্রকাশ হও ॥"

ওই নিরবদ্য নিবন্ধটির মধ্য দিয়া লেখকের স্বদেশভক্তির পূত ধারা প্রবাহমান। 'জ্ঞান প্রেম শক্তির আধার বঙ্গভূমির' মধ্যে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন ভগবতী-বিভূতির প্রকাশ। দেবীর নিকট ভক্ত সন্তান প্রার্থনা করিয়াছেন—'জগৎশ্রেষ্ঠ ভারত-জাতির' জন্য 'হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান'।

জ্ঞান-তপস্বী মাতৃভক্ত শ্রীঅরবিন্দ মাতৃভাষার চর্চা করিতে যাইয়া যে বাংলা কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন, সে-কথা তাঁহার কয়েক জন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। আলিপুর বোমার মামলার প্রায় ছেচল্লিশ বৎসর পরে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে শ্রীঅরবিন্দের হস্তলিপি প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার লিখিত বলিয়া বোমার মামলার নথিপত্র হইতে আটটি কবিতার পাণ্ডুলিপি (ফোটো) প্রদর্শিত

হইয়াছিল। ওই সমুদয় ভিন্ন প্রদর্শিত বস্তুর মধ্যে ছিল—তাঁহার সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত পত্রাবলী। কিন্তু পণ্ডিচেরী 'শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম' হইতে 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে পরে জানানো হইয়াছে যে, প্রদর্শিত কবিতাগুলি শ্রীঅরবিন্দের রচিত নহে। তবে তিনি যে বাংলা ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা ঠিক; সেই সমস্ত কবিতা আশ্রমে রহিয়াছে, প্রকাশিত হয় নাই। এই কারণে উল্লিখিত আটটি কবিতা তাঁহার রচনা হইতে বাদ দিলাম।

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা প্রবন্ধ ও বাংলা কথোপকথন হইতে তাঁহার ভাব-সম্পদের প্রাচুর্যের পরিচয় মিলিবে, শব্দ-সম্পদও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। মাতৃভাষার চর্চা তিনি ঐকান্তিকতার সহিতই করিতেছিলেন। বঙ্গজননীর স্নেহ-শীতল আশ্রয় ছাড়িয়া যাইবার পর সেই চর্চা আকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল। নতুবা বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে আমরা দেখিতে পাইতাম,—অরবিন্দ-রচিত আরও কত সুষম ও সুরভি মাল্য। তাঁহার কি ইংরাজী, কি বাংলা রচনার এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে,—তাহাতে কখনও দুঃখ দৈন্য, লজ্জা বা শঙ্কার সুর শোনা যায় নাই। অরবিন্দ-রচনাবলীর মাধ্যমে আমারা শুনিয়াছি—আশা আনন্দ ও শক্তির কথা, মুক্তি-সাধনার অভয়-বাণী। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি :—

……"ভারতের বীণাপাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝঙ্কার,—
নাহি তাহে দুঃখ তান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস।"……

'স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি'

যে-অরবিন্দের লোকোত্তর প্রতিভা ও মনীষা, দেশ-সেবায় ত্যাগ ও দুঃখবরণ, জন্মভূমির বন্ধন-মোচনার্থ নিঃশেষে সর্বস্ব দানের সংকল্প-গ্রহণ—একদা অগণিত ভারতবাসীকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, আমি সে-অরবিন্দের কথাই বলিব। স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন সাধারণ সৈনিক আমি। স্বদেশী-যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গান্ধী-যুগের শেষ পর্বে স্বাধীন ভারতের সৃষ্টি পর্যন্ত আমার যে সৈনিক-জীবন, তাহার উপরও সে-অরবিন্দের প্রভাব বিস্ময়কর! মুক্তি-সাধনার যে সকল মৃত্যুঞ্জয় সাধকের পুণ্যাবদান আমার সৈনিক-জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রেরণা দিয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদের অন্যতম।

স্বদেশী যুগে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদা রাজ্যের সরকারী কলেজের মাসিক সাড়ে সাত শত টাকা বেতনের সহ-অধ্যক্ষের পদ ছাড়িয়া দিয়া বাংলা দেশে চলিয়া আসেন, এবং মাসিক মাত্র দেড় শত টাকা বেতনে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ পরিচালিত কলিকাতা ন্যাশন্যাল্ কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন, তখন এই ত্যাগই দেশবাসীকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছিল! বরোদার মত একটি প্রগতিশীল প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্যে দেওয়ানের আসন প্রাপ্তি ভাবী কালে যাঁহার পক্ষে সুনিশ্চিত ছিল, দেশের জন্য তিনি সেই লোভনীয় পদ ও রাজ-সম্মানের মায়া অতি সহজে কাটাইলেন; তখনকার দিনে বাংলার নব-জাগৃতির শুভ সুপ্রভাতে তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশীয় নরনারী আশ্চর্য হইয়াই তাহা লইয়া আলোচনা করিত! কিন্তু তাহারা তো ইহা জানিত না যে, বন্দিনী দেশ-মাতৃকার মুক্তিকল্পে শ্রীঅরবিন্দ চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। সেকালে অরবিন্দ-মানসে প্রতিভাত হইত

"ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের" আনন্দ মঠের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে বর্ণিত জন্মভূমি-জননীর রূপ। তিনি শৃঙ্খলিতা মায়ের মুক্তির চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। বাংলার সে-যুগের চারণ-কবির বেদনা-ভরা কণ্ঠে গীত সঙ্গীতের এই পদটিও বুঝি-বা থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কানে বাজিত :

"কংস-কারাগারে দেবকীর মত,
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত,
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত—
পরিচয় তুমি তারই সন্তান।"

যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সহিত কিছুকাল অধ্যক্ষতা করার পর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্তৃপক্ষের সহিত মতানৈক্যের দরুন শ্রীঅরবিন্দকে পদত্যাগ করিতে হইল। শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষের শিক্ষা-দানের সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি প্রবেশ করিলেন লোক-সেবক সাংবাদিকের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে। তৎকালের ভারত-বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক পত্র "বন্দে মাতরম্" সম্পাদনার ভার তিনি গ্রহণ করিলেন। জাতীয়তাবাদী দলের (ন্যাশন্যালিস্ট্ পার্টির) মুখপত্র "বন্দে মাতরম্"-এর মাধ্যমে ভারতীয় স্বাদেশিকতার নব নব বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। সম্পাদক-প্রধান শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার সাংবাদিক সহকর্মীরা মুক্তিকামী জাতির সম্মুখে নব-জাতীয়তার আদর্শ স্থাপন করিলেন। "বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা"—জাতির লক্ষ্য বলিয়া "বন্দে মাতরম্" প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীঅরবিন্দ-সম্পাদিত এই সমাদৃত ও সম্মানিত পত্রিকা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুমুক্ষু দেশবাসীকে বলিয়া দিল যে, জাতীয়তাবাদীর বাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে মধ্যপন্থী দলের (মডারেট পার্টির) অনুসৃত আবেদন-নিবেদনের পথ ছাড়িতে হইবে। জাতিকে হইতে হইবে আত্ম-নির্ভরশীল, গড়িয়া তুলিতে হইবে জাতির সংহতি-শক্তি, স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী

বর্জনের কার্যক্রমকে সফল করিয়া তুলিতে হইবে পূর্ণমাত্রায়। জাতীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, গ্রামে গ্রামে সালিশী আদালত স্থাপন, আর্ত ও দুর্গতের সেবা ইত্যাদি কার্যের মধ্য দিয়া জাতিকে হাতে-কলমে শিখিতে হইবে নিজের দেশ নিজে শাসন করিবার প্রাথমিক কাজগুলি।

স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণ যুগে "বন্দে মাতরম্"-এর শ্রীঅরবিন্দের লেখনী-মুখে নির্গত হইয়াছে আশা ও নির্ভীকতার জ্বলন্ত বাণী। "বন্দে মাতরম্" জাতিকে দিয়াছে এক নূতন পথের সন্ধান। স্বদেশী যুগের মধ্যপর্বে বিদেশী রাজার অনুসৃত নির্যাতন-নীতির প্রয়োগে যখন জাতির চিত্ত নৈরাশ্যে আছন্ন হইতেছিল এবং দেশবাসীর মন অবসাদে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল,—আমাদের জাতীয় জীবনের সেই দুর্যোগের দিনে "বন্দে মাতরম্"-এর মধ্য দিয়া স্বাদেশিকতার ঋষি বজ্র-নির্ঘোষে শুনাইয়াছেন অভয় বাণী। সেদিন মুক্তি-সেনার অধিনায়ক শ্রীঅরবিন্দ জাতিকে মৃত্যু মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া রণ-ক্ষেত্রে নামিবার জন্য উদাত্ত-কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সে-আহ্বান নিষ্ফল হয় নাই। তরুণ বাংলা সেনাপতির ডাকে সাড়া দিয়াছিল, বাঙালী যুবক দলে দলে মৃত্যু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মুক্তি-অভিযানে যোগদান করিয়াছিল।

"বন্দে মাতরম্"-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য কিরূপ সময়োচিত, নির্ভীক ও সতেজ ছিল তাহার সামান্য পরিচয় এস্থলে দিতেছি। দমন-নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগের ফলে পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী দলের নেতা দেশ-বিশ্রুত লালা লাজপৎ রায় যখন (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে) বৃটিশ ভারতের বাহিরে বিনা বিচারে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তখন "বন্দে মাতরম্"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল :

"The sympathetic administration of Mr. Morley has for the present attained its record—but for the

present only. Lala Lajpat Rai has been deported out of British India. The fact is its own comment. The telegram goes on to say that indignation meetings have been forbidden for four days. Indignation meetings? The hour of speeches and fine writings is past. The bureaucracy has thrown down the gauntlet. We take it up. Men of the Panjab! Race of the Lion! Show these men before they would stamp you into the dust that for one Lajpat they have taken away, a hundred Lajpats, will arise in his place. Let them hear a hundred times louder your war-cry —Joy Hindusthan!" ("Bande Mataram"—May 10).

অর্থাৎ :—"মিঃ মর্লির সহানুভূতিপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থার চরম নিদর্শন মিলিল এখনকার মতো—তবে ইহা শুধু এখনকার মতোই। লালা লাজপৎ রায় বৃটীশ ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন। এই প্রকারের ব্যাপার সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ বাহুল্য মাত্র। তারের সংবাদে জানা যায় যে, চারি দিনের জন্য বিক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশার্থ জন-সভার অধিবেশন নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশার্থ সভা? বক্তৃতা ও মনোরম রচনার দিন এখন গত হইয়াছে। আমলাতন্ত্র আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে। আমরাও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছি। পাঞ্জাবের অধিবাসিগণ! সিংহের জাতি তোমরা! —এই যে লোকগুলি তোমাদিগকে ধূলায় নিষ্পেষিত করিতে চাহিতেছে, ইহাদিগকে দেখাইয়া দেও যে, একজন লাজপৎকে লইয়া গেলে আর কি হইবে; তাঁহার স্থানে যে শত লাজপতের আবির্ভাব হইবে। ইহারা শুনুক তোমাদের শতগুণ উচ্চরোলে ধ্বনিত রণ-নিনাদ—জয় হিন্দুস্থান!"

সেই বৎসরই "বন্দে মাতরম্"-এর একটি প্রবন্ধের জন্য

রাজদ্রোহের অভিযোগে শ্রীঅরবিন্দ অভিযুক্ত হইলেন। বিপ্লবী দলের মুখপত্র বাংলা সাপ্তাহিক "যুগান্তর"-এর "কাব্‌লি দাওয়াই" নামক একটি প্রবন্ধের অনুবাদ "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধের জন্যই "বন্দে মাতরম্"-এর সম্পাদক বলিয়া শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়। মুদ্রাকর ও প্রকাশক অপূর্বকৃষ্ণ বসুও অভিযুক্ত হন। তৎকালে সংবাদপত্রে সম্পাদকের নাম প্রকাশ করার কোন বিধি ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ যে সম্পাদক—সরকার পক্ষ তাহা প্রমাণ করিতে পারিল না। ফলে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পাইলেন; কিন্তু অপূর্বকৃষ্ণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। সেই উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত "নমস্কার" কবিতার মধ্য দিয়া শ্রীঅরবিন্দকে অভিনন্দিত করিলেন। সেই অপূর্ব কবিতার আরম্ভ হইয়াছে এই ভাবে:

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মুর্তি তুমি। তোমা লাগি' নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব বাধাহীন,—"

কবি এই ভাবে প্রশস্তি নিবেদন করিয়া বলিতেছেন:

"বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থ-যাত্রীর সঙ্গীত, চির প্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর।"......

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড

সাহেবের আদালতে শ্রীঅরবিন্দ ও অপূর্বকৃষ্ণের বিচার হইয়াছিল। আরও বহু স্বদেশী মামলার বিচার করিয়াছিলেন এই ইংরাজ বিচারক। তাঁহার বিচারে আসামীরা দণ্ডিতও হইয়াছিলেন। একটি ইংরাজ পুলিস সার্জেন্টকে ঘুসী মারার জন্য জাতীয় বিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র সুশীল সেনকে তিনি বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই বর্বরোচিত দণ্ডে দেশে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। যুগান্তর বিপ্লবী দল এই বর্বরতার প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। বিপ্লবীদের হাতে কিংস্‌ফোর্ডের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে বুঝিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিরাপত্তার জন্য বিহারের মজঃফরপুর সহরে জিলা জজের পদে নিয়োগ করিয়া বদলী করিলেন।

১৯০৭ সন কাটিয়া গেল। ১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল রাত্রি। মজঃফরপুর সহরে ইউরোপীয়ান ক্লাবের প্রবেশদ্বারে একখানি চলন্ত ফিটন গাড়ী লক্ষ করিয়া প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু মারাত্মক বোমা নিক্ষেপ করিল। সেই ঘোড়ার গাড়ীতে কিংস্‌ফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন দুই জন ইংরাজ মহিলা। তাঁহারা নিহত হইলেন। আমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে বোমা-নিক্ষেপকারী বিপ্লবী যুবকদ্বয় পলাইয়া গেল। পরদিন পয়লা মে, ক্ষুদিরাম ধরা পড়িল পুলিসের হাতে, আর তৎপরদিন দোসরা মে মোকামাঘাট স্টেশনে প্রফুল্লকে পুলিস ধরিবার চেষ্টা করিলে বীর যুবক পর-পর দুইবার রিভল্‌ভারের গুলী ছুড়িয়া আত্মহনন করিল। পরে নরহত্যার অপরাধে ক্ষুদিরাম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বিপ্লবে দীক্ষিত যে-যুবকের —'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'—সে তো হাসি মুখেই মৃত্যু বরণ করিবে। মায়ের মুক্তির জন্য "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়-গান"—ক্ষুদিরাম তাহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রথম শহীদ-যুগল প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম ছিল—শ্রীঅরবিন্দের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত যুগান্তর বিপ্লবী দলেরই মৃত্যু-মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান।

মজঃফরপুরের বোমা-নিক্ষেপের ঘটনার পরে ২রা মে, কলিকাতায় ব্যাপক খানাতল্লাসী হয়। কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে মাণিকতলায় বোমা নির্মাণের কারখানা ও অস্ত্রাগার আবিষ্কৃত হইল। মাণিকতলা বাগান ও অন্যান্য স্থান হইতে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইলেন। কলিকাতার বাহিরেও নানা স্থানে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার হইয়াছিল। ইহা হইতে সৃষ্টি হইল মাণিকতলা বোমার মামলা। চব্বিশ-পরগনা জিলার আলিপুরে এই ষড়যন্ত্রের মামলার বিচার হইয়াছিল বলিয়া ইহা আলিপুর বোমার মামলা নামেও পরিচিত। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ, নরহত্যা, বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রাদি রাখা ইত্যাদি অভিযোগে আসামীরা অভিযুক্ত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দকে দলের নেতা বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা হইল।

শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবীকে বাংলা ভাষায় লিখিত তিনখানি পত্র—প্রমাণে ব্যবহারের জন্য আদালতে সরকার পক্ষ হইতে দাখিল করা হয়। সেই পত্র তিনখানি হইতে তাঁহার সাধন-জীবনের কথা, স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ, জন্মভূমি-জননীকে বন্ধন-মুক্ত করার অবিচলিত সংকল্প এবং হিন্দু ধর্ম্মে অগাধ বিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে স্বদেশ জড় পদার্থ নহে,—জাগ্রত জীবন্ত দেবী। তিনি স্বদেশকে মা বলিয়া জানেন, ভক্তি করেন এবং পূজা করেন। এই ভাব নূতন নহে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "আনন্দ মঠ" উপন্যাসের মধ্য দিয়া এই ভাব বহুপূর্বেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটির মধ্য দিয়া এই ভাবের অভিব্যঞ্জনা ও দ্যোতনা। "আনন্দ মঠের", "সন্তান" ভবানন্দের মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের শুনাইয়াছেন এই বাণী:

"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি

গরিয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই—আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা—"

এই মহাভাবের উদ্ভাবক ও উদ্‌গাতা বলিয়া শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' আখ্যা দিয়াছেন। অরবিন্দের "Rishi Bankim Chandra" প্রবন্ধে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেই অনুপম প্রবন্ধের একস্থলে আছে :—

"Among the Rishis of the later age we have at last realised that we must include the name of the man who gave us the reviving mantra which is creating a new India, the mantra Bandemataram"

অর্থাৎ :—পরিশেষে আমরা ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, পরবর্তী যুগের ঋষিগণের মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির নাম তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত করিব, যিনি আমাদের দিয়াছেন সঞ্জীবন-মন্ত্র বন্দে মাতরম্, যাহাতে নব্য ভারতের সৃষ্টি হইতেছে।

যে পত্রখানি হইতে উদ্ধৃতি দিলাম, তাহা লেখা হইয়াছিল ১৯০৫ সালের ৩০শে আগষ্ট। সেই দীর্ঘ পত্রের অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন :

"দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতী ঘাড়ে চেপেছে, পাগলামীটা এই, যে-কোন-মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে হইবে। আজ-কালকার ধর্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্মিক! তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই

পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই।"

১৯০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের আর একখানি পত্রে আছে ভগবানে তাঁহার আত্মসমর্পণের কথা। তিনি লিখিতেছেন ঃ

..."যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেইখানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে গিয়াছিলাম। আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে এস, তখন যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব ; কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল যে, এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।...কিন্তু এখন আর আমার স্বাধীনতা নাই. এরপরে তোমাকে বুঝিতে হইবে যে আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল।...

ভারত-বিশ্রুত রাজনৈতিক নেতা এবং আলিপুর বোমার মামলার প্রধান আসামী শ্রীঅরবিন্দ যে উত্তর কালে দিব্য-জীবন লাভ করিবার জন্য সাংসারিক জীবন ও রাজনৈতিক কর্মজীবনের যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া মহাসাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পূর্বোক্ত পত্রগুলিতেই রহিয়াছে।

বিচারাধীন আসামী-রূপে এক বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল শ্রীঅরবিন্দ কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। ১৯০৯ সালের ৬ই মে, আলিপুরের সেসন্ জজ্ মিঃ বিচ্‌ক্রফ্‌টের রায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীঅরবিন্দ সমস্ত অভিযোগের দায় হইতে নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় আলিপুরের কারাবাস হইয়াছিল তাঁহার আশ্রম-বাস। নিশিদিন শ্রীহরির ধ্যান ও যোগ-সাধনার মধ্য দিয়া তিনি কঠোর কারাজীবনকে রূপান্তরিত করিলেন—শান্তিময় আশ্রম-জীবনে। তাঁহার ধ্যান ও যোগ-সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। আলিপুর জেলে 'সলিটারি সেলে' তিনি "নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শন" পাইলেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁহার "কারাকাহিনী" হইতে এই সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিতেছি। "কারাকাহিনীর" আরম্ভেই আছে ঃ

"১৯০৮ সনের শুক্রবার ১লা মে, আমি "বন্দে মাতরম্" আফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আমার হাতে জঃফরপুরের একখানি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দু'টি য়ুরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সেদিনের 'এম্পায়ার' কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিস কমিশনার বলিয়াছেন, আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না, তখন যে আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল! আমিই পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত নেতা! জানিতাম না যে, এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসরের কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল, সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে! আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া নূতন কর্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে! বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস; বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস—এক বৎসর

আশ্রমবাস। অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম। জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে প্রভুভাবে লাভ করিব। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই! শেষে পরম দয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি, সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধনকুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার! আমার জীবনে এই আশ্চর্য বৈপরীত্য বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি যে, আমার হিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই উপকার করুন, অনিষ্টকারিগণ—শত্রু কাহাকে বলিব!—শত্রু আমার নাই—শত্রুই আমার অধিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনিষ্ট করিতে গেলেন, ইষ্টই হইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম।"

কারামুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ নূতন জীবন-লইয়া পুর্ণোদ্যমে ভগবান ও দেশের সেবায় পুনরায় আত্মনিয়োগ করিলেন। মাসাধিক পরেই (জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে) তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হইল ইংরাজী সাপ্তাহিক "Karmayogin"—"a weekly review of national religion, literature, science, philosophy, etc," আর আগষ্ট মাসের (১৯০৯) তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইল, বাংলা সাপ্তাহিক পত্র "ধর্ম্ম"। এই দুইখানি পত্রিকার মাধ্যমে তিনি জাতিকে শুনাইয়াছেন ধর্ম্ম ও জাতীয়তার নব-নব বাণী, নৈরাশ্যের অন্ধকারে দেখাইয়াছেন, আলোক-বর্তিকা, এবং নিপীড়িত ভয়ার্ত দেশবাসীকে দিয়াছেন 'অভীঃ' মন্ত্র। এই কাগজের সম্পাদনায় আমরা সন্ধান পাইয়াছি শ্রীঅরবিন্দের একটা নূতন কার্যক্রমের। ইংরাজী দৈনিক "বন্দে মাতরম্"-এর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনীতি। তৎকালে ওইরূপ লক্ষ্য রাখিয়া জাতীয়তাবাদী দলের

মুখপত্র "বন্দে মাতরম্" সম্পাদনার আবশ্যকতাও ছিল। "কর্মযোগিন্" ও "ধর্ম" হইতে রাজনীতি বাদ দেওয়া হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে ধর্মের প্রাধান্য ছিল। তবে শ্রীঅরবিন্দের প্রচারিত ধর্ম, সাধারণতঃ ধর্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা নহে। এই ধর্ম জাতীয় ধর্ম বা "national religion." এই ধর্মের লক্ষ্য শুধু নিজের মুক্তি নয়,—জাতির মুক্তি, দেশের মুক্তি, বিশ্ব-মানবের মুক্তি।

কাগজ দুইখানি যথেষ্ট লোকপ্রিয়তা অর্জন করা সত্ত্বেও এক বৎসর কালও চালানো সম্ভব হইল না। কেননা, তৎকালে বিদেশী রাজের দমন-নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগ চলিতেছিল। "অরবিন্দ ঘোষ" স্বাক্ষরে "To my countrymen" (আমার দেশবাসিগণের প্রতি) শীর্ষক একখানি দীর্ঘ পত্র কর্মযোগিনে প্রকাশিত হইল। পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল জাতীয়তাবাদী দলের (ন্যাশন্যালিস্ট্ পার্টির) উদ্দেশ্যে। ইহাতে দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির নির্ভীক আলোচনা ছিল, আর ছিল জাতীয় দলের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত কার্যক্রম। তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ নিন্দা করিয়াছেন দমন-নীতির। দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন দৃঢ় সংকল্প লইয়া ত্যাগ স্বীকার এবং নির্যাতন-ভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়া কর্মক্ষেত্রে নামিতে। মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারাবলীকে তিনি বলিয়াছেন—"monstrous and misbegotten scheme" অর্থাৎ বিকট ও কৃত্রিম পরিকল্পনা ; এবং দেশবাসী এইরূপ শাসন-সংস্কার যে চাহে না তাহাও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়া দেন। পত্রের একস্থলে আছে—"What is it for which we strive ? The perfect self-fulfilment is our ultimate goal." অর্থাৎ—আমাদের প্রচেষ্টা কিসের জন্য ? পূর্ণাঙ্গ আত্মবিকাশ আমাদের চরম লক্ষ্য।

এই ঐতিহাসিক পত্রের মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ বিদেশী রাজার নিকট

শাসন-সংস্কার সম্পর্কে কয়েকটি সঙ্গত এবং ন্যায্য দাবী উত্থাপন করিয়া সোজাসোজি বলিয়া দিয়াছেন যে, ওই দাবীগুলি পূরণ না করিলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের "Passive resistance"-এর পন্থা অবলম্বন করা হইবে। তেজস্বী নির্ভীক দেশনায়ক শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় তাহা ব্যক্ত হয় এই ভাবে :

…"Until these demands are granted we shall use pressure of that refusal of co-operation which is termed passive resistance. We shall exercise that pressure within the limits allowed us by the law, but apart from that limitation, the extent to which we shall use it depends expediency and the amount of resistance we have to overcome."

অর্থাৎ :—যে পর্যন্ত না এই সমুদয় দাবী পূরণ হয় সে পর্যন্ত আমরা সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিয়া চাপ দিব এবং ইহারই নাম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। আমরা সেই চাপ দিব আইনের সীমার মধ্যে থাকিয়া কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার কথা বাদ দিলেও কতদূর পর্যন্ত আমরা ইহার প্রয়োগ করিব, তাহা নির্ভর করে অবস্থানুযায়ী ঔচিত্যের উপর এবং যে পরিমাণ প্রতিরোধ আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে তাহার উপর।

এই পত্রে শ্রীঅরবিন্দ মধ্যপন্থী দলের (Moderate Partyর) তৎকালীন নীতি, কর্মপন্থা ও মনোভাবের তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, মধ্যপন্থীরা জাতীয়তাবাদিগণের সহযোগিতা ও আনুকূল্য ভিন্ন বিদেশী সরকারের বিরোধিতা করিতে এবং সবল আন্দোলন চালাইতে অসমর্থ। তাঁহাদের নেতৃত্বে ভারতের রাজনীতিক জীবন অবসন্ন ও নীরব হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্বোক্ত পত্রের জন্য সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক রাজদ্রোহের

অভিযোগ আনা স্থির হইল। তিনি কোন সূত্রে ইহা জানিতে পারিয়া গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা বাহির হইবার পূর্বেই গোয়েন্দা পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া সরিয়া পড়েন। নিম্ন আদালতের বিচারে মনোমোহন ঘোষ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। হাইকোর্টে আপিলের বিচারে দণ্ডাদেশ নাচক হইয়া গেল এবং এই সিদ্ধান্ত হইল যে, শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানিতে রাজদ্রোহিতার কিছুই নাই। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা কর্মযোগিনের রাজদ্রোহের মামলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কথা। শ্রীঅরবিন্দের কারামুক্তির পর তখন দশ মাসও শেষ হয় নাই। তিনি "কর্মযোগিন্" ও "ধর্ম" পত্রিকার কার্যালয়ে সন্ধ্যার পরে একদিন তাঁহার গ্রেপ্তার আসন্ন বলিয়া সংবাদ পাইলেন বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদারের মুখে। রামচন্দ্র "ধর্ম" পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে একজন সহকারী ছিলেন। সেই রাত্রিতেই গুপ্ত গোয়েন্দা পুলিসের নজরবন্দী শ্রীঅরবিন্দ সদা-সতর্ক পুলিস-দৃষ্টি কুয়াসা-জালে আচ্ছন্ন করিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। নৌকায় করিয়া বৃটিশ এলাকা ছাড়িয়া তিনি চলিয়া গেলেন চন্দননগরে।

শ্রীঅরবিন্দের নৌকা চন্দননগর পৌঁছিল পরদিন ভোর-ভোর সময়। সঙ্গে ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ওরফে মণি। তাহার পরিচিত বন্ধু অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের কাছে তিনি আশ্রয় দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া লোক পাঠাইলেন। চারুবাবু আশ্রয় দিতে সম্মত হন নাই। মতিলাল রায় একজন বন্ধুর মুখে এই অসম্মতির কথা শুনিতে পাইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও নিজে নৌকা-ঘাটে যাইয়া শ্রীঅরবিন্দকে নিয়া আসেন এবং নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেন।

চন্দননগরে অজ্ঞাতবাসে শ্রীঅরবিন্দের দিন কাটিত ধ্যান, তপস্যা ও সাধনার মধ্য দিয়া। মতিবাবুর বাসভবনে কয়েক দিন অবস্থান

করার পর নিরাপত্তার জন্য এবং গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে চন্দননগরেই তাঁহাকে অন্য বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইল। চন্দননগরের এই অজ্ঞাতবাসেই শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রম-জীবনের পটভূমিকা রচিত হইয়াছে বলিলে সম্ভবতঃ ভুল হইবে না। তাঁহার অজ্ঞাত বাসের জীবনের নিখুঁত ও জীবন্ত আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে মতিবাবুর বিচিত্র তুলিকায় "জীবন-সঙ্গিনী"র পাতায় পাতায়। শ্রীঅরবিন্দের সাধন-জীবনের যে-দিকটা ভক্ত-শিষ্যের শুচি-শুভ্র নির্মল দৃষ্টিতে রবিকরোজ্জ্বল দিবালোকের মতো পরিষ্কার হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই রহস্যাবৃত দিকটাও মতিবাবু তাঁহার অনুপম রচনার মধ্য দিয়া উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

তিনি পণ্ডিচেরী চলিয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইবার পর ৩১শে মার্চ রাত্রিতে তাঁহার চন্দননগরে অজ্ঞাত-বাসের জীবনে যবনিকা পড়িল।

গঙ্গা-বক্ষে চলন্ত নৌকায় শ্রীঅরবিন্দের রাত্রি কাটিল। পরদিবস প্রত্যুষে উত্তরপাড়ার অদূরে একটি ঘাটে নৌকা ভিড়িল। সেই রাত্রিতেই তিনি পণ্ডিচেরীর যাত্রী হইয়া কলিকাতার চাঁদপাল ঘাটে "ডুপ্লেস্‌ক্‌" জাহাজে উঠেন। সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন বিজয় নাগ। তাঁহারা ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরী পৌঁছেন।

"স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি" শ্রীঅরবিন্দ বাংলা-মায়ের কোল শূন্য করিয়া সেই যে অদৃশ্য হইলেন, আর তো ফিরিয়া আসিলেন না! সে দিন কে জানিত যে, পণ্ডিচেরী-যাত্রার দিনই তাঁহার বাংলা হইতে চিরবিদায়ের দিন!

স্বাধীনতা-সংগ্রামের মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দ

..."অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্ত পানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত-ভাবে আহার করিতে বসে, না স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মা'কে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"...

পরাধীন ভারতে দেশ ও জাতিকে কে দিয়াছিলেন এই বাণী? দিয়াছিলেন—ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মহানায়ক, মুক্তি-সাধনার মহাসাধক শ্রীঅরবিন্দ। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার প্রায় বেয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবীকে একখানি পত্রে ঐকথাগুলি লিখিয়াছিলেন। কিছুকাল এই বাণীমালা ছিল পতি-পত্নীর পত্রালাপের মধ্যেই নিবদ্ধ। প্রায় বৎসর তিনেক পরে শ্রীঅরবিন্দ মাণিকতলা বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হইবার কালে তাঁহার লিখিত পত্র অন্যান্য কাগজ-পত্র সহ পুলিসের হস্তগত হয়। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রমাণের জন্য বিদেশী সরকারের পক্ষ হইতে ঐ সমুদয় আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল। তখন সংবাদপত্রে মামলার বিবরণের সঙ্গে সেই পত্র প্রকাশিত হয়, ফলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় সেই বাণী। সত্য সাময়িকভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও একদা আত্ম-প্রকাশ করিবেই। মুক্তি-যজ্ঞের ঋত্বিক শ্রীঅরবিন্দের ঐ বাণীর মধ্যে রহিয়াছে শাশ্বত চিরন্তন সত্যঃনহিত ; সুতরাং তাহা সূর্য্যরশ্মির মতো আপনা হইতেই বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশকে যে মা বলিয়া জানিতেন, ভক্তি করিতেন ও পূজা করিতেন, উহার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলিবে তাঁহার রাজনীতিক জীবনের নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্ম্মাবদানের মধ্যে—দেশমাতৃকার বন্ধন-মোচনের জন্য তাঁহার ত্যাগ দুঃখবরণ ও সর্ব্বস্ব সমর্পণের কঠোর ব্রত পালনের মধ্যে। স্বদেশী যুগের মধ্য পর্বে ভারত বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে তাঁহার সম্পাদিত ইংরাজী সাপ্তাহিক "কর্ম্মযোগিন্" ও বাংলা সাপ্তাহিক "ধর্ম্ম" পত্রিকার মধ্য দিয়া—"আমার দেশবাসীর নিকট একখানি খোলা চিঠি" ("An open letter to my countrymen") শীর্ষক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—"Our ideal is that of Swaraj or absolute autonomy free from foreign control". ভারতবর্ষ যে অদূর ভবিষ্যতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে —স্বরাজের আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে পারিবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণীও শ্রীঅরবিন্দের মুখে আমরা কতবার শুনিয়াছি। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বে বাঙলা দেশের উপর দিয়া যখন স্বৈরাচারী বিদেশী শাসকমণ্ডলীর লাঞ্ছনা-নিগ্রহের ঝটিকা বহিয়া যাইতেছিল তখন তিনি জাতিকে আশ্বাসবাণী দিয়াছিলেন—ভগবান তোমাদের মুক্ত হইতে আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং তোমাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী— "God commands you to be free and you must be free."
"অরবিন্দ ঋষি, তাহার ঋষি-দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল শৃঙখল-

মুক্তা দেশজননীর মহিমান্বিত মুর্ত্তি, স্বাধীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল চিত্র। ঋষি-বাণী ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার জীবদ্দশায়ই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। পনেরই আগষ্ট ঋষি শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন,—স্বাধীন ভারতেরও প্রতিষ্ঠা-দিবস। এই অপূর্ব্ব যোগাযোগ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ঐ উপলক্ষে প্রচারিত বিবৃতিতে তিনি সে আনন্দ ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

আবেদন-নিবেদনের দ্বারা স্বাধিকার অর্জন যে সম্ভব হইবে না, এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যুবক অরবিন্দ তাঁহার কয়েকটি ইংরাজী প্রবন্ধের মধ্য দিয়া ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে। তৎকালে তিনি বরোদায় মহারাজার কলেজে উপাধ্যক্ষের কাজ করিতেন। এই সম্পর্কে তাঁহার বাঙলা ভাষায় রচিত "কারাকাহিনী" (১৯০৯ খ্রীঃ) হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

…"মনে পড়ে, আমি পনের বৎসর আগে বিলাত হইতে দেশে আসিয়া যখন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলান তখন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যুবকদের মনে এই প্রবন্ধগুলির ফল হইতেছে দেখিয়া তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবা মাত্র আমাকে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কোনও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন।"

স্বদেশের দাসত্ব-মোচনের জন্য শ্রীঅরবিন্দ যৌবনে সশস্ত্র বিপ্লবের গুপ্ত পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন। তিনি, মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী নেতা পুণার ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন এবং গুজরাট শাখার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। বাঙলা দেশে বিপ্লবের বীজ কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার বলিয়া অন্তরের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন—তাঁহার বিখ্যাত অতুলনীয়

"নমস্কার" কবিতার মাধ্যমে সে-দিন কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে অরবিন্দের জয় :—

"...তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন ? তাই উঠে বাজি'
জয় শঙ্খ তাঁর ? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি' দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মতো ? জয় তব জয়।
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা ? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল ?"

অরবিন্দ-মানসে জন্মভূমির জননী-রূপ যে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার মূলে রহিয়াছে বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা। অরবিন্দ স্বয়ং ইহা অকুণ্ঠ-চিত্তে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশপ্রেমের এই মহনীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি দেশ ও জাতির সেবাকে পরমেশ্বরের সেবা বলিয়া জানিতেন, শৃঙ্খলিতা দেশ-জননীর মুক্তির সংগ্রামকে ধর্ম-সাধনা বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহার অনাবিল দেশভক্তি আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় বঙ্কিম-চন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র ভবানন্দের বাণী—"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী নাই, ভাই নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই—আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা—"

এই আদর্শের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমকে ধর্ম্মের আসনে উন্নীত করিয়াছেন। 'জন্মভূমিই জননী'—এই জ্ঞানের

উন্মেষ বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়াই হইয়াছে। এই জন্য অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' আখ্যা দিয়াছেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, পরবর্তী কালের ঋষিগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নামও স্থান পাইবে, কেননা, যে বন্দে মাতরম্ সঞ্জীবন-মন্ত্রে নব্য ভারতের সৃষ্টি হইতেছে, উহা তাঁহারই দান। অরবিন্দের মতে,—বঙ্কিম-রচনাবলীর তত্ত্বকথাই হইল স্বদেশপ্রেম-ধর্ম এবং ইহাই 'আনন্দমঠে'র প্রাণ-বাণী। যে বন্দে মাতরম্ আজ অখণ্ড ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, সেই মহাসঙ্গীতের মধ্য দিয়াই ঐ প্রাণ-বাণীর অনবদ্য ছন্দোময় প্রকাশ।...মায়ের দর্শন লাভের উপযোগী অন্তর্দৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের দিয়াছেন।

অরবিন্দ ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার উপাসক। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর রাজনীতিক লক্ষ্য হইল—বৈদেশিক কর্তৃত্বমুক্ত পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য—"absolute autonomy free from foreign control." বোমার মামলা হইতে মুক্তি পাইবার পরে ঐ একই আদর্শ তিনি প্রচার করিয়াছেন তাঁহার সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন্' ও বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকার মধ্য দিয়া। বাংলার উর্বর ভূমিতে বিপ্লবের বীজ তিনিই বপন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব) বাঙলায় আসিয়া গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। এই কার্যে সহযোগিতা করিয়াছিলেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র, সরলা দেবী প্রমুখ বিপ্লবপন্থিগণ। পরবর্তী কালে দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের গুপ্ত পন্থা পরিহার করিয়াছিলেন। বোমার মামলা হইতে মুক্তি-লাভের পর অরবিন্দ তাঁহার রচনা ও ভাষণের মধ্য দিয়া "Passive Resistance" অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পন্থা অবলম্বনের উপর বিশেষ জোর দিয়া-ছিলেন। ১৯০৯ সালে কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারে এক জনসভায় বক্তৃতাদান-কালে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিদেশী সরকার যদি

লোকায়ত্ত সরকারে পরিণত হয়, তবে সহযোগিতা (Co-operation) করা যাইতে পারে। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমাদের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive Resistance-এর) পথ ধরিয়াই চলিতে হইবে এবং ইহাই একমাত্র শান্তিপূর্ণ পথ। বিদেশী শাসকগণ যদি আমাদের প্রাথমিক অধিকারগুলিও কাড়িয়া নেন, তবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, শান্তিপূর্ণভাবে দুঃখভোগ এবং সহযোগিতা করিতে শান্তিপূর্ণভাবে অস্বীকার করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় নাই।...

ইহার প্রায় বার বৎসর পরে ভারতের রাজনীতিক রণক্ষেত্রে অপর এক মহানায়কের অধিনায়কত্বে বিদেশী রাজার বিরুদ্ধে সেই অস্ত্রই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের আরব্ধ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে গান্ধীজীর নেতৃত্বে। মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি-অভিযান যে জয়যুক্ত হইবে, সে ভবিষ্যদ্বাণীও আমরা শুনিয়াছি শ্রীঅরবিন্দের মুখে। স্বাধীনতার আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে ভারত-ব্যবচ্ছেদের অভিশাপের সঙ্গে। কিন্তু সে অভিশাপ হইতে জাতি যে একদা মুক্তি পাইবে—ওই আশার বাণী তিনি আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় ছাত্র-শিষ্য দেশ-বিশ্রুত জন-নায়ক শ্রী কে. এম. মুন্সী পণ্ডিচেরির 'শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম' হইতে সেই বাণী দেব-দূতের মতো বহন করিয়া আনিয়াছেন ভারতবর্ষে। শ্রীঅরবিন্দ দেবতা। দেব-বাণী নিষ্ফল হইতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দের তিরোভাব হইয়াছিল ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখ। তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আজ আবার দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। নৈরাশ্যের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবাসী দেখিতে পাইবে—সেই দেব-বাণীর মধ্যে আশার আলোক-বর্তিকা। ব্যবচ্ছেদের অভিশাপমুক্ত অখণ্ড ভারত দর্শনের আশায় আমরা সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

লোকোত্তর-লোকের শ্রীঅরবিন্দ

আজ এই প্রবন্ধে আমরা লোকোত্তর-লোকের শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা ইহলোক-বাসী সাধারণ লোক, দিব্যলোকের সন্ধান রাখি না। সে লোক কী এবং কোথায় কিছুই জানি না। না জানিলেও, এমন একটি লোকোত্তর-লোক যে আছে, তাহা বিশ্বাস করি। আমাদের মধ্যে যে অতি-অল্পসংখ্যক লোক ইহলোকে থাকিয়াও দিব্যলোকের সন্ধান পাইয়াছেন এবং সেই লোকে হয়তো বা বিচরণও করিয়াছেন, তাঁহারা লোকাতীত অধ্যাত্ম-শক্তির অধিকারী মহাপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তাঁহাদেরই একজন।

অনেকেই জানেন ও চিনেন সেই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে—যিনি ছিলেন ভারত-বিশ্রুত রাজনীতিক নেতা, অপরাজেয় বিপ্লবী নায়ক, সাংবাদিক, বক্তা ও লেখক এবং অনন্যসাধারণ প্রতিভা, মনীষা, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কিন্তু লোকোত্তর-লোকের শ্রীঅরবিন্দকে জানেন খুব কম লোকই। লোকোত্তর-লোকের শ্রীঅরবিন্দকে জানিতে হইলে, প্রথমে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পরিক্রমা আবশ্যক; অধ্যাত্মসাধনার পটভূমিকায়ই তাঁহার সেই মূর্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ইংলণ্ডে বিদ্যাভ্যাস-কালে এগারো বৎসর বয়সেই তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, উত্তর-কালে পৃথিবীতে একটা ব্যাপক অভ্যুত্থান ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ আসিবে এবং উহাতে তাঁহার অংশ গ্রহণ করা নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং স্বদেশের দাসত্ব-মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ওই ধারণা নিয়ন্ত্রিত হইল। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় কথাটি এই:

"At the age of eleven Aurobindo had already

received strongly the impression that a period of general upheaval and great revolutionary changes was coming in the world and he himself was destined to play a part in it. His attention was now drawn to India and this feeling was soon canalised into the idea of the liberation of his own Country."

ওই ধারণা একাদশবর্ষীয় বালকের মনে উদিত হওয়া বস্তুতঃ-পক্ষে বিস্ময়কর! আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীঅরবিন্দের জীবিত-কালে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি ইংলণ্ডে যান মাত্র সাত বৎসর বয়সে (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে); এবং প্রায় চৌদ্দ বৎসর কাল তথায় থাকিয়া শিক্ষা-সমাপ্তির পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন একুশ বৎসর বয়সে। তখনও তিনি যোগাভ্যাস কিংবা অন্য কোন প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনা আরম্ভ করেন নাই। স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর হইতে মারাঠা যোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ বৎসর কালের মধ্যে তাঁহার চারিটি অপূর্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ('spiritual experiences'-এর) সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি দিয়াছেন। প্রথমটির অভিজ্ঞতা লাভ হয় বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বোম্বে নগরের অ্যাপোল্লো বন্দরে পৌঁছিবার পরে। ভারতের মৃত্তিকায় পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই এক সুদূরবিস্তৃত প্রশান্তি ('vast calm') তাঁহার উপর নামিয়া আসে, এবং অনেক মাস যাবৎ ইহা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। বরোদা-বাসের প্রথম বৎসরে একটি শকট-দুর্ঘটনার বিপদের মুখোমুখি হইয়া শ্রীঅরবিন্দ দর্শন পাইলেন তাঁহার হৃদয়োত্থিত দেবতার। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের অপর একটি স্থান—কাশ্মীর রাজ্যে তাক্তী-সুলেমানের মিলন-ক্ষেত্রে। তথায় নদী-তীরে ভ্রমণকালে তাঁহার উপলব্ধি হইল শূন্য অনন্তের—('vacant infi-

nite'-এর)। আর একটি অভিজ্ঞতা লাভ করেন নর্মদাতটে এক মন্দিরের অভ্যন্তরে, যেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন জাগ্রত দেবীকে,সজীব কালী মাতাকে। কোন প্রকার 'সাধনা' ব্যতীত তিনি পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাগুলি লাভ করিয়াছিলেন। ওই সমুদয় তাঁহার অন্তর্লোকে প্রকাশ পাইল আপনা হইতেই।

শ্রীঅরবিন্দের যৌগিক সাধনার কাহিনীও বিচিত্র! তাঁহার যোগাভ্যাস আরম্ভ হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গুরু ব্যতীতই। তাঁহার এক বন্ধু ছিলেন গঙ্গা-মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য; সেই বন্ধুর নিকট হইতে নিয়ম জানিয়া লইয়া তিনি যোগাভ্যাসে রত হন। প্রথমে তাহা প্রাণায়ামে সীমাবদ্ধ ছিল; এবং কোন কোন দিন তিনি এই কৃচ্ছ্র-সাধ্য প্রাণায়ামে আত্মনিয়োগ করিতেন ছয় ঘণ্টারও ঊর্ধ্বকাল। শ্রীঅরবিন্দের স্বলিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তাঁহার যৌগিক ও রাজনীতিক সাধনা চলিয়াছিল একই সঙ্গে; সেই জন্য দুইটির মধ্যে কোন প্রকার সংঘর্ষ ঘটে নাই। যোগ-সাধনার জন্য তিনি যে একজন গুরুর সন্ধানে ছিলেন, তাহা সত্য। সেই সন্ধান উপলক্ষে তিনি সাক্ষাৎ পাইলেন একজন নাগা সন্ন্যাসীর। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে যদিও গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তবু যৌগিক শক্তিতে শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। কারণ শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতিতে সেই সন্ন্যাসী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে অতি অল্প সময়ের ভিতর আশ্চর্য উপায়ে সাংঘাতিক রোগ হইতে মুক্ত করেন। বারীনবাবু দীর্ঘ কাল ধরিয়া পাহাড়ে-জ্বরে (hill fever-এ) ভুগিতেছিলেন। সন্ন্যাসী এক গ্লাস জল লইয়া নিঃশব্দে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ছুরি দিয়া জল কোনাকুনি কাটিলেন এবং সেই মন্ত্রপূত জল পান করিয়া বারীনবাবু নিরাময় হইলেন। গঙ্গা-মঠের ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গেও শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং স্বামীজী সম্পর্কে তাঁহার উচ্চ ধারণা জন্মিল।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রের মাধ্যমে সন্ধান

পাইলেন সাধক বিষ্ণু ভাস্কর লেলের। বারীনবাবু সদ্‌গুরুর অন্বেষণে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া লেলের দর্শন পাইলেন ঘটনাক্রমে। তাঁহার অসাধারণ ও অত্যাশ্চর্য যোগ-শক্তির পরিচয়ও বারীনবাবু পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"...লেলে যে অসাধারণ শক্তিমান সাধক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একদিন সেজদার বাড়িতে বসিয়া উপেনের অতি গুহ্য কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, উপেনকে একদিন কাছে বসাইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে মুক্তির এক আনন্দের স্তরে অল্প ক্ষণের জন্য তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।..."

বারীনবাবুর বৈপ্লবিক সাধনার সতীর্থ উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও লেলের অলৌকিক শক্তির কথা তাঁহার লেখায় উল্লেখ করিয়াছেন। লেলে ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ; গৃহী হইলেও মহাযোগী ও মহাসাধক। বারীনবাবু তাঁহার সেজদা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর) গিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি লেলে-অরবিন্দের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন বরোদায়। সুরাট কংগ্রেস ভাঙিয়া যাওয়ার পরে কী ভাবে ১৯০৮ খ্রীঃ জানুয়ারিতে উভয়ের সাক্ষাৎ এবং 'অরবিন্দের সাধন লাভ' হয়, তৎসম্পর্কে বারীনবাবুর লেখা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

"কংগ্রেস ভাঙিল কাহার দোষে? এ কলহে কোন্‌টি ধর্ম পক্ষ আর কোন্‌টি অধর্ম পক্ষ, তাহা লইয়া দেশময় সোরগোল পড়িয়া গেল। গরম দলের নেতারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন এবং স্থানে স্থানে সভা-সমিতিতে আপনাদের পক্ষের কথা দেশের লোককে বিশদ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। সুরাট হইতে অরবিন্দ আসিলেন গায়কোবাড়ের রাজধানী বরোদায়।...

"......অরবিন্দ আসিতেছেন শুনিয়া বরোদা কলেজের প্রিন্সিপাল আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, কোন ছাত্র যেন তাঁহার অভ্যর্থনায় না যায়। স্টেশন হইতে কলেজ-গেটের পাশ দিয়াই

পথ। আমাদের গাড়ি ওই অবধি আসিবা মাত্র সমস্ত কলেজ ভাঙিয়া ছাত্র বাহির হইয়া আসিল ও ঘোড়া খুলিয়া 'বন্দে মাতরম্' রবে গাড়ী টানিতে লাগিয়া গেল। কলেজের শূন্য ক্লাসে প্রফেসাররা একা বসিয়া কড়িকাঠ গুণিতে গুণিতে প্রহর অতীত করিলেন।

"বরোদা যাত্রার পূর্বেই আমি লেলেকে তার করি যে, অরবিন্দ তাঁহার দর্শনাভিলাষী। বেলা ৮।৯টায় লেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাতে ও অরবিন্দে একান্তে আধ ঘণ্টা আলাপ হইল, আমরা তখন সার স্থবা খাসিরাও যাদবের বাড়ীতে। লেলের সহিত সেই প্রথম আলাপের পর বরোদায় তিনটি সভায় অরবিন্দ বক্তৃতা দেন, এবং একবার মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহার পর আর কেহ অরবিন্দকে পায় নাই। তখন দেশময় তাঁহাকে চায়। বরোদায় কত মানুষ তাঁহাকে দেখিতে উন্মুখ। লেলে কিন্তু বলিলেন, 'আমার সাধনা তোমায় দেব, কিন্তু একান্তে সাত দিন আমার সঙ্গে থাক।' অরবিন্দ বলিলেন, 'কোথায়?'

"লেলে: 'আমি গোপন স্থানের ব্যবস্থা করবো।'

"তাহাই হইল। হঠাৎ অরবিন্দ উধাও হইলেন। চারিদিকে পাগলের মত শহর সমেত মানুষ যাঁহাকে খুঁজিতেছে, তিনি কোথাও নাই! যেখানে লেলের নির্দেশে আমরা গেলাম, সে এক বিরাট জনহীন পুরী। সেখানে লেলের স্ত্রী রাঁধেন; অরবিন্দ, লেলে ও আমি খাই। তাঁহারা দু'জনেই মুখোমুখি ধ্যানে কাটান। আমায়ও লেলে বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, আমি মাঝে মাঝে বসি বটে, কিন্তু মাথায় তখন বিপ্লবের পোকা গজ গজ করিতেছে; তাহারা আমায় স্থির হইয়া বসিতে দিবে কেন? কাজেই কোন গতিকে ফাঁক পাইয়াই আমি সরিয়া পড়ি এবং একটি তালা ঢালাইয়ের কারখানায় বসিয়া ঢালাইয়ের কাজ দেখি ও শিখি। বোমার বারুদের জন্য পিতলের বা কাঁসার আধার ঢালাই করিতে হইবে, কোথায় তাহা শিখিব তখন আমার কেবল সেই চেষ্টা।...

"অরবিন্দ স্বভাব-যোগী ও ধীরপ্রকৃতি, বরোদায় সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি পুস্তকের রাশির মধ্যে ডুবিয়া যে অসাধ্য জ্ঞানের তপস্যা তাঁহাকে করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে বেশ স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল যে, তিনি কোন্ অসাধারণ ধাতুর তৈয়ারী। কয়েক দিনের অনন্যমন সাধনায় লেলের সমস্ত যোগবল অরবিন্দে সঞ্চারিত হইয়া গেল, মাত্র তিন দিনে তিনি অচল নীরব ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিলেন। বরোদা হইতে বোম্বাইয়ে আসিলে এই অপূর্ব সাধনা আরও ফুটিল, স্বতঃস্ফূর্ত মন্ত্র আপনি উঠিতে লাগিল।

"পুণায় বক্তৃতা-কালে অরবিন্দ লেলের উপদেশে আগে কর্তব্য বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া বক্তৃতা দেওয়া ছাড়িয়া দিলেন। শান্ত হইয়া শূন্য মন নিয়া বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইবা মাত্র, আপনি অনর্গল কথার পর কথা কে যেন অন্তরে বসিয়া যোগাইয়া দিত। তাহার পর তাঁহার কলিকাতা যাত্রা; যাইবার পূর্বে তিনি লেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন তো আমি আপনাকে সঙ্গে পাব না, কিরূপ কি প্রণালীতে সাধনায় চলতে হবে আমায় বলে দিন।' লেলে প্রথমে সাধনার নানা উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ থামিয়া বলিলেন, 'তোমার কাছে যে বাণী এসেছে, তাতে অকপট বিশ্বাস স্থাপন করে চলতে পারবে?'

"অর: 'হ্যাঁ, তা সহজেই পারব।'

"লে: 'তবে তাই কর, তা হলে আর কোন উপদেশই দরকার হবে না। ওই বাণীই তোমায় সব বুঝাবে ও করাবে।'

"তাহার পর আমার কলিকাতা প্রত্যাবর্তন ও অরবিন্দের পুণার দিকে যাত্রা।..."

বারীনবাবুর প্রদত্ত পূর্বোক্ত বিবরণ যে সত্য, তাহা অরবিন্দের লেখায়ও প্রকাশ পাইয়াছে। দীর্ঘ বারো বৎসর কাল (১৯০৯—১৯২১ খ্রীঃ) আন্দামানে দ্বীপান্তর-দণ্ড ভোগের পর বারীনবাবু মুক্তি পান এবং উহার বৎসরেক পরে তাঁহার সম্পাদিত 'বিজলী' সাপ্তাহিক

পত্রিকায় ওই বিবরণাদি প্রকাশিত হয়। ইহার অনেক বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দ আপন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, লেলের উপদেশ-মতে তিনি জনসভায় ভাষণ দিবার প্রাক্কালে দাঁড়াইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'নমস্কার' দিয়া অপেক্ষা করিতেন মাত্র, কি বলিবেন বা বলিবেন না, সে বিষয়ে কোন চিন্তাই করিতেন না। বস্তুতঃ পক্ষে আপনা হইতেই তাঁহার ভাষণ আসিত এবং তদবধি বরাবর সমুদয় ভাষণ, লেখা, চিন্তা ও বাহ্য সক্রিয়তা তাঁহার নিকট ওই ভাবেই আসিত—মস্তিষ্ক-মানসের বাহিরে একই উৎপত্তি-স্থান হইতে। শ্রীঅরবিন্দের লিখিত বর্ণনা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"....Lele told him to make *namaskar* to the audience and wait and speech would come to him from some other source than the mind. So, in fact, the speech came, and ever since all speech, writing, thought and outward activity have so come to him from the same source above the brain-mind."

সুরাট কংগ্রেসের মাস চারেক পরে (২রা মে ১৯০৮) অরবিন্দ কলিকাতায় গ্রেফ্‌তার হইলেন মানিকতলা বাগানের বোমার মামলার সংস্রবে। আলিপুর দায়রা আদালতে সেই মামলার বিচার হওয়ায় তাহা আলিপুর বোমার মামলা বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বৎসরাধিক কাল বিচারাধীন আসামীরূপে কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া তিনি মুক্তি পাইলেন ১৯০৯ খ্রীঃ ৬ই মে। তাঁহার কারাবাসের দীর্ঘ দিনগুলি কাটিয়াছে ধ্যান, তপস্যা ও যোগ-সাধনায়। তাঁহার লেখা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি। মজঃফরপুরের বোমা-বিস্ফোরণের ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন :

"জানিতাম না যে এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসরের কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল, সবই ছিন্ন হইবে,

এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া নূতন কর্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে। বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস: বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস; অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ-দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন-কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার।"

কারাজীবনের কঠোরতার মধ্যেও, প্রতিকূল অবস্থা এবং বহু বাধা-বিঘ্নের ভিতরেও—অরবিন্দের আধ্যাত্মিক সাধনা চলিতে লাগিল দুর্নিবার গতিতে; যেন গিরি-শিখর হইতে নির্ঝরের স্বচ্ছ-নির্মল জলপ্রবাহ সাবলীল বেগে উপল-স্তূপ অতিক্রম করিয়া বহিয়া যাইতেছে কোন্ বাঞ্ছিতের সন্ধানে। অল্পকাল মধ্যেই নারায়ণের কৃপায় অন্তরায় তিরোহিত হইল এবং অনুকূল পরিবেশ দেখা দিল। সেই বর্ণনাও তাঁহার লেখায় রহিয়াছে। আলিপুর জেলখানার 'যোগাশ্রমে' তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের নব-নব অনুভূতি ও উপলব্ধি এবং অতিপ্রাকৃত (supernatural) অভিজ্ঞতা লাভের কথা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কারামুক্তির পরে তাঁহার উত্তরপাড়া-ভাষণেও কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে। এই সম্পর্কে তাঁহার কারাবাসের কাহিনী হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি:

"...একদিন অপরাহ্নে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তা আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তা সকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং-লুপ্ত বা এক মুহূর্ত ভ্রষ্ট হয় নাই, বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব ক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু আমি উন্মত্ততা-ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল, সমস্ত শরীরময় এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে, পূর্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে, আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনেই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল। ইহার পরে কয়েকবার বদ্ধাবস্থায় অশান্তি, নির্জন কারাবাস ও কর্ম-হীনতায় মনের অশোয়াস্তি, শারীরিক ক্লেশ ও ব্যাধি, যোগান্তর্গত কাতর অবস্থা ঘটিয়াছে, কিন্তু সেদিনে ভগবান এক মুহূর্তে অন্তরাত্মায় এমন শক্তি দিলেন যে, এই সকল দুঃখ মনে আসিয়া ও মন হইতে চলিয়া যাইবার পরে কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিতে পারিত না, দুঃখের মধ্যেই বল ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বুদ্ধি মনের দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইত। সেই দুঃখ পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ বোধ হইত। তাহার পরে যখন পুস্তক আসিল, তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বই না আসিলেও থাকিতে পারিতাম। যদিও আমার আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লেখা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য নয়, তথাপি এই ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরে দীর্ঘকাল নির্জন কারাবাসে কেমন করিয়া আনন্দে থাকা সম্ভব হইল, তাহা এই ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে। এই

কারণেই ভগবান সেই অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন। তিনি উন্মত্ততা না ঘটাইয়া নির্জন কারাবাসে উন্মত্ততার ক্রমবিকাশের প্রণালী আমার মনের মধ্যে অভিনয় করাইয়া বুদ্ধিকে সেই নাটকের অবিচলিত দর্শকরূপে বসাইয়া রাখিলেন। তাহাতে আমি শক্তি পাইলাম, মানুষের নিষ্ঠুরতায় অত্যাচার-পীড়িত ব্যক্তিদের উপর দয়া ও সহানুভূতি বাড়িল এবং প্রার্থনার অসাধারণ শক্তি ও সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।”

নির্জন কারাকক্ষের (solitary cell-এর) বাহিরে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লির কোর্টে এবং দায়রা জজ মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌টের আদালতে মামলার শুনানী-কালেও অরবিন্দ আসামীর কাঠগড়ায় বসিয়া প্রায়ই ধ্যানস্থ থাকিতেন। কিন্তু জনাকীর্ণ আদালত-গৃহের অবিশ্রান্ত হট্টগোলের মধ্যে প্রথমে তিনি সমাহিত হইতে পারেন নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বাসুদেবের কৃপায় নির্জন কারাকক্ষে সাধনার যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। স্থান-পরিবর্তনের জন্য যে বিঘ্ন আসিয়া পথ রোধ করিল, তাহা ছিল অল্পকাল-স্থায়ী। পরে আদালত-গৃহেও সাধনার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হইল। কাঠগড়ায় উপবিষ্ট সঙ্গীয় আসামীদের হাসি-তামাশার হৈ চৈ এবং আদালত-গৃহের গোলমালের মধ্যেও অরবিন্দ প্রায়ই ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। এই বিষয়ে সেই মহাযোগী নিজে কী লিখিয়া গিয়াছেন তাহা শুনাইতেছি:

“নির্জন কারাবাসের নীরবতা হইতে হঠাৎ বহির্জগতের কোলাহলের মধ্যে আনীত হইয়া প্রথম মন বড় বিচলিত হইল, সাধনার স্থৈর্য ভঙ্গ হইল এবং সেই পাঁচ ঘণ্টা কাল মোকদ্দমার নীরস ও বিরক্তিকর কথা শুনিতে মন কিছুতে সম্মত হইল না। প্রথম আদালতে বসিয়া সাধনা করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু অনভ্যস্ত মন প্রত্যেক শব্দ ও দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হইত, গোলের মধ্যে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইত, পরে ভাবের পরিবর্তন হয় এবং সমীপ-

"...একদিন অপরাহ্ণে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তা আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তা সকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং-লুপ্ত বা এক মুহূর্ত ভ্রষ্ট হয় নাই, বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব ক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু আমি উন্মত্ততা-ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল, সমস্ত শরীরময় এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে, পূর্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে, আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনেই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল। ইহার পরে কয়েকবার বদ্ধাবস্থায় অশান্তি, নির্জন কারাবাস ও কর্ম-হীনতায় মনের অশোয়াস্তি, শারীরিক ক্লেশ ও ব্যাধি, যোগান্তর্গত কাতর অবস্থা ঘটিয়াছে, কিন্তু সেদিনে ভগবান এক মুহূর্তে অন্তরাত্মায় এমন শক্তি দিলেন যে, এই সকল দুঃখ মনে আসিয়া ও মন হইতে চলিয়া যাইবার পরে কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিতে পারিত না, দুঃখের মধ্যেই বল ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বুদ্ধি মনের দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইত। সেই দুঃখ পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ বোধ হইত। তাহার পরে যখন পুস্তক আসিল, তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বই না আসিলেও থাকিতে পারিতাম। যদিও আমার আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লেখা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য নয়, তথাপি এই ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরে দীর্ঘকাল নির্জন কারাবাসে কেমন করিয়া আনন্দে থাকা সম্ভব হইল, তাহা এই ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে। এই

কারণেই ভগবান সেই অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন। তিনি উন্মত্ততা না ঘটাইয়া নির্জন কারাবাসে উন্মত্ততার ক্রমবিকাশের প্রণালী আমার মনের মধ্যে অভিনয় করাইয়া বুদ্ধিকে সেই নাটকের অবিচলিত দর্শকরূপে বসাইয়া রাখিলেন। তাহাতে আমি শক্তি পাইলাম, মানুষের নিষ্ঠুরতায় অত্যাচার-পীড়িত ব্যক্তিদের উপর দয়া ও সহানুভূতি বাড়িল এবং প্রার্থনার অসাধারণ শক্তি ও সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।"

নির্জন কারাকক্ষের (solitary cell-এর) বাহিরে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লির কোর্টে এবং দায়রা জজ মিঃ বীচক্রফ্‌টের আদালতে মামলার শুনানী-কালেও অরবিন্দ আসামীর কাঠগড়ায় বসিয়া প্রায়ই ধ্যানস্থ থাকিতেন। কিন্তু জনাকীর্ণ আদালত-গৃহের অবিশ্রান্ত হট্টগোলের মধ্যে প্রথমে তিনি সমাহিত হইতে পারেন নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বাসুদেবের কৃপায় নির্জন কারাকক্ষে সাধনার যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। স্থান-পরিবর্তনের জন্য যে বিঘ্ন আসিয়া পথ রোধ করিল, তাহা ছিল অল্পকাল-স্থায়ী। পরে আদালত-গৃহেও সাধনার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হইল। কাঠগড়ায় উপবিষ্ট সঙ্গীয় আসামীদের হাসি-তামাশার হৈ চৈ এবং আদালত-গৃহের গোলমালের মধ্যেও অরবিন্দ প্রায়ই ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। এই বিষয়ে সেই মহাযোগী নিজে কী লিখিয়া গিয়াছেন তাহা শুনাইতেছি :

"নির্জন কারাবাসের নীরবতা হইতে হঠাৎ বহির্জগতের কোলাহলের মধ্যে আনীত হইয়া প্রথম মন বড় বিচলিত হইল, সাধনার স্থৈর্য ভঙ্গ হইল এবং সেই পাঁচ ঘণ্টা কাল মোকদ্দমার নীরস ও বিরক্তিকর কথা শুনিতে মন কিছুতে সম্মত হইল না। প্রথম আদালতে বসিয়া সাধনা করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু অনভ্যস্ত মন প্রত্যেক শব্দ ও দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হইত, গোলের মধ্যে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইত, পরে ভাবের পরিবর্তন হয় এবং সমীপ-

বর্তী শব্দ দৃশ্য মনের বহির্ভূত করিয়া সমস্ত চিন্তাশক্তি অন্তর্মুখী করিবার শক্তি জন্মাইয়াছিল, কিন্তু মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় তাহা ঘটে নাই, তখন ধ্যানধারণার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। সেই কারণে এই বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতাম, অবশিষ্ট সময় বিপদকালের সঙ্গীদের কথা ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতাম, অথবা কখনও নর্টন সাহেবের শ্রবণযোগ্য কথা বা সাক্ষীর সাক্ষ্যও শুনিতাম। দেখিলাম, নির্জন কারাগৃহে যেমন সময় কাটান সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিয়াছে, জনতার মধ্যে এবং সেই গুরুতর মোকদ্দমার জীবন-মরণের খেলার মধ্যে সময় কাটান তেমন সহজ নয়। অভিযুক্ত বালকদের হাসি তামাশা ও আমোদ প্রমোদ শুনিতে ও দেখিতে বড় ভাল লাগিত, নচেৎ আদালতের সময় কেবলই বিরক্তিকর বোধ হইত। সাড়ে চারটা বাজিলে সানন্দে কয়েদীদের গাড়ীতে উঠিয়া জেলে ফিরিয়া যাইতাম।”

কারাগারে শ্রীঅরবিন্দের সাধন-জীবনের চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর কাহিনী তাঁহার কারাসঙ্গী বারীন্দ্র ঘোষ এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়ও রহিয়াছে। বারীনবাবু তাঁহার সেজদাদা কারাবাসী শ্রীঅরবিন্দের যৌগিক সাধনা ও ধ্যানমগ্ন থাকা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ

“আমার সাধনা লেলের দুই তিনটি ক্রিয়া লইয়া ; কিন্তু তখন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব খুব বেশী, তখন সবে তাঁহার কথামৃতগুলি ও চৈতন্যভাগবত পড়িতেছি। চৈতন্যদেব, শ্রীরাম-কৃষ্ণ ও লেলে এই ত্রিস্রোতায় পড়িয়া আমার গোড়ার সাধনা প্রধানতঃ ভক্তিমুখীই ছিল। তখন সেজদাও শ্রীকৃষ্ণসমর্পিত-প্রাণ, তাঁহার প্রভাবও আমার মাঝে অলক্ষ্যে কম কাজ করে নাই। তাহার উপর দেবব্রতের প্রেমের সাধনা, সে নিজের সাধনায় গীতার জ্ঞান ও কমলাকান্ত-চণ্ডীদাসের প্রেম অপূর্ব সামঞ্জস্যে মিশাইয়া

লইয়াছিল। যখন সেসন্স কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, তখন দেবব্রত, আমি, নরেন বক্সী, বিজয় নাগ ও শচীন্দ্র সেন এক-সঙ্গে সাধনা করিতেছি। অরবিন্দ মৌন নিশ্চল আসনে দিবারাত্র সাধনায় মগ্ন, জেলে কুঠরীতে তাঁহার সেই অবস্থা, কোর্টেও একটি কোণে একান্তে আপনাতে আপনি ডুবিয়া তাঁহার তদবস্থা।

"আমাদের সাধনায়—কথা ছিল, গান ছিল, শাস্ত্রপাঠ, তর্কবিতর্ক ছিল; তাঁহার সাধনা কিন্তু একেবারে মৌন অন্তর্মুখ একাগ্র ব্যাপার; তাঁহার সঙ্গী ছিল না, কাজ ছিল না, অন্য ভাবনা চিন্তা ছিল না, ছিল শুধু পূর্ণ উৎসর্গে—

"যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্ত নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥"

"দেখিলে মনে হইত এ মানুষ আর বহির্জ্ঞানে জাগিয়া নাই, যেন স্বপ্নে চলিতেছে, বলিতেছে, যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাহিরের দুয়ার দিয়া অন্তরের কোনও নিভৃত পুরীর মহোৎসবে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলেই সাধনমুখী মানুষের আপনিই সাধন পাইত, তাই তাঁহার নীরব প্রভাব এ কয়টি জীবনে তখন বড় কম কাজ করে নাই।"

উপেন্দ্রনাথের বর্ণনা হইতেও উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

"...এই হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত বসিয়া থাকিতেন—অরবিন্দ। কোন কথাতেই হাঁ, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম। কেহ বলিত—তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না, কেহ বলিত—তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। ভাত খাইবার সময় আরসুলা, টিকটিকি ও পিঁপড়াদের ভাত খাওয়াইয়া দেন; স্নান করেন না, মুখ ধোন না, কাপড় ছাড়েন না—ইত্যাদি। ব্যাপারটা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইত; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে

কুলাইত না। মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না; কিন্তু দেখিতাম যে, অরবিন্দবাবুর চুল যেন তেলে চক্‌চক্ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কি স্নান করিবার সময় মাথায় তেল দেন?' অরবিন্দবাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন: 'আমি তো স্নান করি না।' জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনার চুল এত চক্‌চক্ করে কি করিয়া?' অরবিন্দবাবু বলিলেন: 'সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের কতকগুলি পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে। আমার শরীর হইতে চুল 'বসা' (fat) টানিয়া লয়।'

"তুই একজন সন্ন্যাসীকে ওরূপ হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝি নাই। তাহার পর ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে আমি লক্ষ্য করিলাম যে, অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাঁচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে; তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে, চিত্তের বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে চক্ষে ওই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। তুই একজনকে তাহা দেখাইলাম; কিন্তু কেহই অরবিন্দকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল: 'আপনি সাধন করে কি পেলেন?' অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটির কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন: 'যা খুঁজেছিলাম, তা পেয়েছি।' তখন আমাদের সাহস হইল, আমরা তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলাম। অন্তর্জগতের কি অপূর্ব কাহিনী শুনিলাম, তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম তাহা নহে, তবে এই ধারণাটি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, এই অদ্ভুত মানুষটির জীবনে সম্পূর্ণ একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলের মধ্যে বৈদান্তিক সাধনা শেষ করিয়া যে সব তান্ত্রিক সাধনা শেষ করিয়াছিলেন, তাহারও কতক কতক বিবরণ শুনিলাম। জেলের বাহিরে বা ভিতরে তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া কখনও আলোচনা

করিতে দেখি নাই। এ সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় শ্রীঅরবিন্দবাবু বলিলেন যে, একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্ম শরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান। মোকদ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন: 'আমি ছাড়া পাব।'

"ফলে তাহাই হইল। মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার এক বৎসর পরে যখন রায় বাহির হইল, তখন দেখা গেল সত্য সত্যই শ্রীঅরবিন্দবাবু মুক্তি পাইয়াছেন।"

বোমার মামলায় মুক্তি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন যে, তিনি ওই বিষয়ে কোন চিন্তাই করিতেন না, সমস্তই বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ও তাঁহার জাতীয়তাবাদী সহকর্মী সি. আর. দাশের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; যে-হেতু তিনি মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্লোক হইতে নিশ্চয়তা পাইয়াছিলেন এবং জানিতেন যে, তিনি অভিযোগ হইতে মুক্ত হইবেন—"for he had been assured from within and knew that he would be acquitted." কারাবাসকালে শ্রীঅরবিন্দ যখন নিভৃতে ধ্যানস্থ থাকিতেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সর্বদাই তাঁহার কথোপকথন হইত এবং এক পক্ষকাল ওইরূপ ঘটিয়াছিল। তৎকালে স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিও তিনি অনুভব করিতেন।

কারামুক্তির পরে শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় যখন ইংরাজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন্' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' প্রকাশিত হইতেছিল, তখন জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রীঅরবিন্দের এক ভক্তের মাধ্যমে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন যে, শীঘ্রই 'কর্মযোগিন্'-এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করা হইবে। 'কর্মযোগিন্'-কার্যালয়ে শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতিতে কয়েক জন ভক্ত সেই বিষয়ে কর্তব্য লইয়া আলোচনা করার কালে শ্রীঅরবিন্দ 'আদেশ' শুনিতে পাইলেন তিনটি শব্দে—"Go to Chandernagore." চন্দননগর

যাও। অনতিবিলম্বে সেই দৈববাণীর নির্দেশ মতে গঙ্গায় নৌকা-যোগে চন্দননগর যাত্রা করেন। চন্দননগরের অজ্ঞাতবাসের অন্তে তিনি অনুরূপ 'আদেশ' শুনিতে পাইলেন পণ্ডিচেরি যাইবার জন্য। যে স্বরে শ্রীঅরবিন্দ আদেশ শুনিয়াছিলেন, উহা তাঁহার সুপরিচিত।

চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের বাস-ভবনে অজ্ঞাতবাস-কালে শ্রী অরবিন্দের মধ্যে তিনি যে কয়েকটি লোকাতীত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে তাঁহার 'জীবন-সঙ্গিনী' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

"...তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) ষোল আনা ভগবানে দেওয়ার কথা বলিয়া গেলেন; এমন কি হাতখানি নাড়িতে চাড়িতেও কোন এক অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাহা পরিচালিত হয়, ইহা বুঝাইতে নিজের হাত উপরে তুলিয়া যেন আমায় দেখাইয়া দিলেন, 'দেখ, ইহা আমি উঠাই নাই, অন্য শক্তি হাতখানি ধরিয়া উপরে উঠাইয়া দিল।' বিশ্বাস করিলে বিস্ময়ের কথা, নতুবা অনায়াসে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমি বিশ্বাস করিলাম।"

"আমার এখনও মনে পড়ে, এই কথার পর তাঁহার গতিবিধি অতিশয় আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। অন্যের চক্ষে ইহা সত্য না হইতে পারে; কিন্তু আমি দেখিয়াছিলাম, তিনি যখন মাটির উপর দিয়া চলিতেন, যেন ভূমির উপর তাঁহার পা পড়িত না, কেমন আল্‌গা আল্‌গা ভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতেন। পদশব্দ হয় কিনা কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু নিঃশব্দ পদসঞ্চার বলিয়া শ্রুতিও ইহা অকপটে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।"

"তিনি যখন ভোজন করিতেন আমার মনে হইত, এই ভোজন ব্যাপারেও তাঁহার কোন চেষ্টা নাই। তিনি অনন্য মনে আহার করিয়া যাইতেন; আমি যে অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতেছি, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতেন না। আমার মনে হইত, সত্যই তাঁহার

মুখ লইয়া অন্য এক তৃতীয় শক্তি আহার করিতেছে। আমার বেশ মনে পড়িতেছে, আমার কর্ণে ভোজনের শব্দ পর্যন্ত স্পর্শ করে নাই; এই ভোজন ব্যাপারও নিঃশব্দে সাধিত হইত।"

"আর একটা আচরণ স্পষ্ট দিনের মত মনে পড়ে। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি কোন মানুষের চাহনি বলিয়া আমার মনে হয় নাই; কে যেন তাঁহার চক্ষুর ভিতর দিয়া আমায় স্পর্শ করিতেছে। অবশ্য এ সবই আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি।..."

"শ্রীঅরবিন্দ প্রায় উর্ধ্ব দৃষ্টিতে থাকিতেন। যখন কথা বলিতেন, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 'আপনি ঐরূপ এক দৃষ্টিতে কী দেখেন?' তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহা বুকে আজও তেমন উজ্জ্বলভাবেই আঁকা আছে। তিনি বলিতেন,—'কতকগুলা লিপি ভাসিয়া আসে; অর্থ বাহির করার চেষ্টা করি।' আবার বলিতেন,—'অলক্ষ্য জগতে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদের আকার ফুটিয়া উঠে। অক্ষরের মত এই সব মূর্তিও অর্থময়—কিছু জানাইতে চাহে, সেগুলিও আবিষ্কার করিতে যত্ন করি।' "

শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি ছাড়িয়া ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া আসিলেন কেন, ইহা লইয়া নানা জনের মনে নানা রকমের প্রশ্ন ও সংশয় জাগিয়াছিল। কেহ কেহ এমনও মনে করিয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টার সফলতায় সন্দিহান হইয়া কিংবা রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার আরব্ধ অভিযান ব্যর্থ হইবে বুঝিতে পারিয়া রাজনীতিক কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কোনটিই সত্য নহে। রাজনীতির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পূর্বেই তিনি ভিতর হইতে জানিতেন, ("knew from within") অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার আরব্ধ কার্য তাঁহার উপস্থিতি কিংবা সক্রিয় অংশ গ্রহণ ব্যতীতই সফল হইবে। যোগ-সাধনার কার্য যেন অন্য কোন প্রকার কার্যের দ্বারা ব্যাহত না হয়, তদনুরূপ

সুনির্দিষ্ট 'আদেশ' তিনি পাইয়াছিলেন। ("because I got a very distinct *adesh* in the matter")। পূর্বোক্ত বিষয়টি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হইবার প্রায় পনর বৎসর পূর্বে। ওই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ আরও লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ভবিষ্যদ্দর্শন যখন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত; ভারতের প্রতিরোধ এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর চাপে বৃটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে যে বাধ্য হইবে, ইহাও তিনি অবগত ছিলেন। এইরূপ অনুভূতি হইতেও তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোন প্রকার সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং উহার প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে গুপ্ত পন্থা পরিত্যক্ত হইতে পারে এবং রাজনীতিতে তাঁহার অংশ গ্রহণেরও কোন আবশ্যকতা নাই।

হিন্দু শাস্ত্রে ঋষিদের ত্রিকালদর্শী বলা হইয়াছে, কেন না তাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিনটি কালের সম্পর্কে অবগত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দও যে সেই শ্রেণীর একজন ঋষি, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাঁহার আধ্যাত্মিক-জীবন—যোগ-সাধনা—লোকাতীত শক্তি এবং সার্থক ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির দ্বারা। যৌগিক সাধনা-লব্ধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিয়াছেন যে, যোগ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করিয়া দিতে পারে, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিতে পারে, এবং কঠিন দুরারোগ্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যাধি হইতে দেহকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে পারে। যোগী যৌগিক ক্রিয়ার বলে অপরের শরীর হইতে নিজের শরীরে রোগ আনিয়া রুগ্ন ব্যক্তিকে নীরোগ করিয়া দিতে পারেন। শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন যে, যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে তিনি একাধিক কঠিন, দুরারোগ্য ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী ব্যাধি হইতে তাঁহার দেহকে মুক্ত করিয়াছেন—"In fact, I have got rid by Yogic pressure of a number of chronic

maladies that had got settled in my body'। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, কলিকাতার একজন জ্যোতির্বিদ নারায়ণ জ্যোতিষী তাঁহার কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ম্লেচ্ছ শত্রুর সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ হইবে, তাঁহার বিরুদ্ধে তিনবার রাজদ্বারে অভিযোগ আনা হইবে, কিন্তু তিনি মুক্তি পাইবেন; এবং ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু-যোগ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু যৌগিক শক্তির সাহায্যে তাহা কাটিয়া যাইবে, তিনি দীর্ঘজীবী হইবেন ও পরিণত বার্ধক্যে তাঁহার দেহান্ত হইবে। নারায়ণ জ্যোতিষী যখন কোষ্ঠী বিচার করিয়া পূর্বোক্তরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন। তবে অন্যান্য জ্যোতিষীরা শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরিতে বাসকালে তাঁহার সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে ঠিক হয় নাই, সেই বিষয়ও তাঁহার লেখায় প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এমন একটি শক্তির বিকাশ হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, তাঁহাদের কাহারও কাহারও মূর্তি তাঁহার দৃষ্টিতে সঠিক প্রতিফলিত হইত। এইরূপ দুইটি ঘটনারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমাও ('The Mother') অনুরূপ শক্তির অধিকারিণী বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যৌগিক সাধনার ফলে কবির কবিত্বশক্তি এবং লেখকের লেখার ক্ষমতা ও মননশীলতা বহুল-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার নিজেরজীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের একটি লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গত দশ কি বিশ বৎসর যাবৎ তিনি পড়াশুনা করেন ক্বচিৎ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার কবিত্বশক্তি ও প্রকাশ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে দশ গুণ। তাঁহাকে লোকে একজন দার্শনিক বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন; তিনি কিন্তু দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। তাঁহার লেখায় যে দার্শনিক তত্ত্ব ও ভাবধারা প্রকাশ পাইয়াছে,

তৎসমুদয়ের উৎস হইল তাঁহার যৌগিক সাধনার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং অনুপ্রেরণা। যে যোগী-সাধক লিখেন, তিনি কিন্তু সাহিত্যিক নহেন, কারণ তিনি লিখেন কেবল তাহাই—যাহা অন্তর্নিহিত ইচ্ছা ও বাণী তাঁহাকে দিয়া ব্যক্ত করাইতে চাহে। তিনি তাঁহার নিজস্ব সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা বৃহত্তর কোন বিষয়বস্তু প্রকাশের প্রণালী এবং যন্ত্র।

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরির আশ্রমে যোগ-সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন বলিয়া পার্থিব ব্যাপার এবং ভারতের ভাগ্য সম্পর্কে কখনও অমনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার যোগ-সাধনার নীতি কেবল দিব্যোপলব্ধি এবং পূর্ণ আধ্যাত্মিক সংবিৎ লাভ নহে, কিন্তু পৃথিবীর ব্যাপারাদি এবং যাবতীয় জীবনকে অধ্যাত্ম চেতনা ও সক্রিয়তার বেষ্টনীর মধ্যে লইয়া আসা। তিনি যোগ-সাধনার ফলে লাভ করিয়াছিলেন এমন একটা অধ্যাত্মশক্তি—যাহা সফলতার সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছে ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনে এবং পার্থিব ব্যাপারে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ চলিতে থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ সেই অধ্যাত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন একনায়কত্বের বিরুদ্ধে, কেন না তাঁহার মতে একনায়কত্ব ও নাৎসীবাদ ছিল আসুরিক শক্তি—যাহার জয়ে মানবজাতি দাসত্বপাশে আবদ্ধ এবং পৃথিবীর প্রগতি ও আধ্যাত্মিক বিবর্তন ব্যাহত হইত।

— শেষ —